ইউনিট ৮

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
International Trade

আধুনিককালে বিশ্বের প্রতিটি দেশই দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা আমদানি ও রপ্তানি করে। অন্য দেশের ভূখন্ড দখলের পরিবর্তে এখন প্রতিটি দেশ বিদেশী বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ফলে প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঐ দেশটির অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ ইউনিটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাঠ-১ এ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পাঠ-২ এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব, পাঠ-৩ এ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

ইউনিট -৮

পাঠ-১ অভ্যন্তরীণ বনাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (Intranational versus International Trade)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বা সুবিধাসমূহ বিশেওষণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনীতিই কোন না কোন ভাবে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যকে পাশ কাটিয়ে কোন দেশই সুস্থভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে না। আর এজন্য কোন একটি দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রায়শঃ বাণিজ্য অবরোধ বাস্তবায়ন করতে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে বাণিজ্য অবরোধ একটি দেশের অর্থনীতিকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পঙ্গু করে দিতে পারে। কাজেই কোন দেশের অর্থনীতিকে বিশেওষণ করতে হলে সে দেশের সাথে অন্যান্য দেশসমূহের লেনদেন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ পাঠে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা, এর প্রয়োজনীয়তা এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তফাৎ সম্পর্কে জানব।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

বর্তমান বিশ্বের কোন দেশই তার নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা নিজস্ব উদ্যোগে এবং দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করতে পারে না। এর প্রধান কারণ হলো, সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং কাঁচামাল তথা প্রাকৃতিক সম্পদ কোন একটি দেশে আনুপাতিক হারে বিদ্যমান নয়। কোন একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হারে বিদ্যমান, আবার কোন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। তাই রাষ্টথসমূহ কোন কোন দ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হারে উৎপাদন করে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ দেশের বাইরে রপ্তানি করে। একইভাবে, রাষ্টথসমূহ যে সকল দ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় কম হারে উৎপাদন করে সে সকল দ্রব্য বাইরে থেকে আমদানি করে তাদের নাগরিকদের সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে তাই বুঝায়, বিভিন্ন রাষ্টেথর মধ্যে বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদান।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করা যায় -

বিভিন্ন দেশের উৎপাদন শর্তের বিভিন্নতা: বিভিন্ন দেশের উৎপাদন শর্ত তথা পরিস্থিতিতে বিভিন্নতা বিদ্যমান। একটি শীত প্রধান দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন- ভূমি, মূলধন, শ্রম, প্রযুক্তি প্রভৃতির পরিমাণ) এবং একটি নাতিশীতোষক্স দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদন শর্তের বিভিন্নতা তাই দুটো দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটনের কারণ হতে পারে।

হ্রাসমান উৎপাদন খরচ: হ্রাসমান উৎপাদন খরচের ধারণাটি উৎপাদনের আয়তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে এক ধরনের 'মিতব্যয়' (economies of scale) উপভোগ করে, অর্থাৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ যে হারে উপকরণসমূহের ব্যবহার বাড়ায় উৎপাদনের পরিমাণ তার চেয়ে অধিক হারে বাড়ে। এতে প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন খরচ কমে। একটি দেশ কোন একটি বিশেষ উৎপাদনক্ষেত্রে এ ধরনের সুবিধে ভোগ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্টেথর টেলিযোগাযোগ এবং সাম্প্রতিক জাপানের ভোগ্য ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা উপভোগকারী কোন দেশ উল্লেখিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষায়ন করলে তুলনামূলকভাবে কম খরচে বিদেশী ভোক্তাদের কাছে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী তুলে দিতে পারে।

রুচির বিভিন্নতা: বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ভোগের ধরনে (consumption pattern) পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে উৎপাদনের শর্ত একই রকম হলেও দুটো দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে। মনে করুন, 'ক' এবং 'খ' দুটো দেশ। উভয় দেশ ধান ও গম সমানভাবে উৎপাদন করতে সক্ষম। এখন মনে করুন, 'ক' দেশে চালের চাহিদা এবং 'খ' দেশে গমের চাহিদা বেশী। সুতরাং এক্ষেত্রে 'ক' চাল আমদানি করবে এবং 'খ' গম আমদানি করবে।

অনুশীলন

বাংলাদেশের ২টি বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নাম যেগুলো আয়তনের মিতব্যয়িতা উপভোগ করছে।

অভ্যন্তরীণ বনাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

শুধু বিভিন্ন দেশের মধ্যেই নয় বরং একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও উৎপাদন শর্ত, ভোগ প্রবণতা এবং উৎপাদন দক্ষতার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এসব পার্থক্যের কারণে একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদান ঘটে থাকে। একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদানকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Intranational Trade) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের কমলালেবু ও চা-পাতা, রাজশাহীর আম ও মুন্সীগঞ্জের কলার উল্লেখ করা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে, আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কারণ উভয় প্রকার বাণিজ্য একই রকম অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, উভয় প্রকার বাণিজ্যই আঞ্চলিক শ্রম বিভাগের ফসল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে কতগুলো সুস্পষ্ট পার্থক্যসমূহ বিদ্যমান এগুলো হল:

উৎপাদনের উপকরণমূহের আন্তর্জাতিক গতিহীনতা: উৎপাদনের উপকরণসমূহ একটি দেশের অভ্যন্তরে মোটামুটিভাবে গতিশীল। অন্যদিকে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণসমূহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে গতিহীন। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতিশীলতার মাত্রাগত পার্থক্যই হচ্ছে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্যের মাপকাঠি। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ তাই উভয় প্রকার বাণিজ্যের জন্য পৃথক পৃথক তত্ত্বের নির্দেশ করে থাকেন। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ শুধুমাত্র উৎপাদনের উপকরণসমূহের আন্তর্জাতিক গতিহীনতাকে আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের তীক্ষ্ণ পার্থক্যের কারণ হিসেবে দায়ী করেন না। প্রথমত: আধুনিক যুগে শ্রম, মূলধন এবং প্রযুক্তি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে গতিশীল এবং দ্বিতীয়ত: দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের উপকরণসমূহের পূর্ণ গতিশীলতার ধারণাটিও সঠিক নয়। সুতরাং উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতিশীলতা বা গতিহীনতার আলোকে আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্য একটি মাত্রাগত ধারণা মাত্র, প্রকৃত ধারণা নয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্নতা: আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্নতা হলো আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার বাণিজ্যের ভিত্তি। তথাপি, প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্নতা উভয় প্রকার বাণিজ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্যের একটি কারণও বটে। প্রাকৃতিক সম্পদের ভিন্নতার ফলে কোন কোন দেশ কৃষিজাত দ্রব্য বেশী পরিমাণে উৎপাদন করতে সক্ষম আবার কোন কোন দেশ শিল্পজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপাদনে দক্ষ। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর দেশগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্য এবং দ্বিতীয় প্রকারের দেশসমূহ শিল্পজাত দ্রব্য আদান-প্রদান করবে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, প্রথম প্রকারের দেশসমূহ কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানির বিনিময়ে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করবে এবং দ্বিতীয় প্রকারের দেশসমূহ শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করবে।

মুদ্রার বিভিন্নতা: লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা ব্যবহার করে থাকে যেমন- বাংলাদেশের টাকা, ভারতের রুপি, যুক্তরাষ্ট্রের ডলার ইত্যাদি। কাজেই আমদানি এবং রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার পূর্বেই একজন আমদানি এবং রপ্তানিকারককে দেশীয় মুদ্রার মাধ্যমে বিদেশীমুদ্রার মূল্যমান নির্ধারণ বা যাচাই করে নিতে হয়। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং মুদ্রার মানের মুক্ত রূপান্তর যোগ্যতার (Free Convertibility of Currency) ক্ষেত্রে এটি একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া (Continuous Process)। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যেহেতু একই মুদ্রায় সংঘটিত হয় সেহেতু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের চেয়ে সহজতর একটি প্রক্রিয়া।

বাণিজ্য নীতির বিভিন্নতা: জাতীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা তথা জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়ানো এবং লেনদেনের ভারসাম্য (balance of payments) নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্য বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করে থাকে। আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, কোটা (Quota) প্রভৃতি বাণিজ্য নীতির হাতিয়ার। বিভিন্ন দেশ এ ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে বলে আন্তর্জাতিকভাবে দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদান অবাধ নয়। অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যসামগ্রী লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা নেই।

দূরত্ব এবং আনুষংগিক বিষয়সমূহ: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেহেতু দুটো দেশের মধ্যে সংঘটিত হয় সেহেতু দূরত্বের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পণ্যসামগ্রী স্থল, জল অথবা আকাশ যে কোন পথেই পাঠানো হোক না কেন, এতে অধিক যাতায়াত খরচ জড়িত বলে পণ্যসামগ্রীর প্রকৃত দাম দাম বেশী পড়ে। সাথে দ্রব্যসামগ্রীর সুদৃঢ় প্যাকিং এবং শিপিং (shipping), ব্যাংকিং ও বীমার (insurance) সেবা গ্রহণ করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় যার প্রভাব দ্রব্যের দামের উপর পড়তে বাধ্য। তদুপরি, শেষোক্ত বিষয়সমূহ একটি জটিল প্রক্রিয়ার নির্দেশক। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের অসুবিধাসমূহ প্রায় অনুপস্থিত।

জীবন যাপন পদ্ধতির বিভিন্নতা: বিভিন্ন দেশের জনগণের রুচিবোধ, রীতিনীতি, আবহাওয়া প্রভৃতিতে পার্থক্য বিদ্যমান। তাই বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সার্বিক জীবন যাপন প্রণালী এবং চাহিদার ধরনও বিভিন্ন। কাজেই অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য প্রস্তুতকৃত দ্রব্যসামগ্রী এবং বিশ্ববাজারের জন্য প্রস্তুতকৃত দ্রব্যসামগ্রীর গুণগত মান এবং আংশিক গঠনেরও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্টেথ মোটরগাড়ী চালানো হয় রাস্তার ডানদিক দিয়ে, কিন্তু বাংলাদেশে চালানো হয় রাস্তার বামদিক দিয়ে। কাজেই যুক্তরাষ্টেথ ব্যবহারযোগ্য গাড়ী বামদিকে-চালিত (left-hand drive) এবং বাংলাদেশে ব্যবহারযোগ্য গাড়ী ডানদিকে-চালিত (Right-hand drive) হবে। সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একজন উৎপাদনকারীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া বা প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয় যা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আইন ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির ধরনের পার্থক্য: অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা ও আইন, কর-হার এবং অনুরূপ নিয়মকানুন দেশের কোন একটি এলাকা বা অঞ্চলের সাথে অন্য একটি এলাকা বা অঞ্চলের মধ্যে সংঘটিত লেনদেনকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ আইনানুগ নীতিমালা ও দর্শন প্রতিটি দেশকে মেনে চলতে হয় যা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন- গ্যাট (GATT) চুক্তি, SAPTA চুক্তি, UNCTAD কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা চুক্তিস্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশের পক্ষে পালন করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু এসব নীতিমালা কোনভাবেই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে না।

লেনদেনের ভারসাম্যজনিত পার্থক্য: লেনদেনের ভারসাম্যের বিষয়টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক অবস্থায় একটি দেশ চাইবে তার আমদানি ব্যয়ের তুলনায় রপ্তানি আয় অধিক হোক। অর্থাৎ লেনদেনের অনুকূল ভারসাম্যই একটি দেশের জন্য কাম্য। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের ভারসাম্য কোন সমস্যাই নয়। এর দুটো কারণ রয়েছে। প্রথমত: একটি দেশের মূলধন অভ্যন্তরীণভাবে সম্পূর্ণ গতিশীল অর্থাৎ দেশের অভ্যন্তরে অ-ভারসাম্য থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থায়নের মাধ্যমে তা দূর করা হয়। দ্বিতীয়ত: জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশসমূহ একে অন্যের সম্পূরক হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে সহযোগিতামূলক অবদান রাখে।

অনুশীলন

বাংলাদেশের মুদ্রা মুক্ত রূপান্তরযোগ্য কিনা? চিন্তা করুন ও লিখুন। নিচের সংক্ষিপ্তরূপগুলো ব্যাখ্যা করুন: GATT, UNCTAD, SAPTA.

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা হয়ে থাকে যে, বাণিজ্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধির চালিকা-শক্তি (trade is the engine of growth)। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে, মুক্ত বাণিজ্য শ্রম বিভাগের উন্মেষ ঘটায় যার ফলে জাতিসমূহের লাভ (gains) সর্বোচ্চ হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি পর্যালোচনায় আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত সুবিধা বা গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়েছি। এ পর্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

অধিক উৎপাদন: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তিই হচ্ছে শ্রম বিভাগ বা বিশেষায়ন (specialization)। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা অনুসারে একটি দেশ সে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োজিত থাকবে যে সমস্ত দ্রব্য দেশটি তুলনামূলকভাবে অধিকতর দক্ষতার সাথে উৎপাদন করতে সক্ষম। বিশেষায়নের ফলে দেশটির মোট উৎপাদন বাড়বে। অন্যভাবে বলা যায়, মুক্ত বাণিজ্যের ফলে সারা বিশ্বের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে।

স্বল্প খরচে উৎপাদন এবং তুলনামূলকভাবে স্বল্পদামে দ্রব্যের প্রাপ্তি: শ্রম বিভাগ বা বিশেষায়নের ফলে বৃহদাকার উৎপাদনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে উৎপাদন বর্ধমান হারে বাড়ে যার ফলশ্রুতিতে একক প্রতি দ্রব্যের উৎপাদন খরচ কমে। সুতরাং কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন না করেও একটি দেশ স্বল্পদামে উক্ত দ্রব্য ভোগ করতে পারে যা দেশে উৎপাদন করলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ বা দাম তুলনামূলকভাবে বেশী হতো।

পুনঃবিশেষায়ন এবং নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন: বিশেষায়নের ফলে যেহেতু দ্রব্যের দাম কমে সেহেতু দ্রব্যের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃবিশেষায়নের (Further Specialization) পথে ধাবিত হয় এবং উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য নতুন নতুন কলাকৌশল বা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ব্রতী হয়।

একচেটিয়ামূলক শোষণের অবসান: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশ্ববাজারে স্থান লাভ করার জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ সবচেয়ে দক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করে যাতে একক প্রতি উৎপাদন খরচ (গড় খরচ) এবং দাম সমান হয়। অন্য কথায় বলা যায়, ভোক্তাগণ সম্ভাব্য সর্বনিম্নদামে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুপস্থিতিতে একচেটিয়ামূলক বাজারের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেখানে দ্রব্যের দাম গড় খরচের চেয়ে অধিক।

সকল দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ: নীতিগতভাবে, অবাধ বাণিজ্য অ-বিভেদমূলক (non-discriminatory)। কাঁচামাল এবং জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করার জন্য প্রতিটি দেশের পক্ষে বিশ্ববাজারে প্রবেশ করার সমান অধিকার রয়েছে। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন কোন দেশ খুব সহজেই দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে দূর্ভিক্ষের মতো কঠিন বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে পারে।

বিশ্বের সীমাবদ্ধ সম্পদের কাংখিত ব্যবহার ও বন্টন: বহু পক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থায় একটি দেশ যেখানে খুশী দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করতে পারে এবং যেখান থেকে খুশী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। অর্থাৎ দেশটি একদিকে যেমন তার রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম নিশ্চিত করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে সর্বনিম্নদামে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করতে পারে। এর ফলস্বরূপ, দেশটি একাধারে উৎপাদনকারী এবং ভোক্তা হিসেবে সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করতে পারে। এতে সীমাবদ্ধ সম্পদের কাংখিত ব্যবহার এবং বন্টন সহজতর হয়।

অনুশীলন

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশের লাভ হচ্ছে নাকি লোকসান হচ্ছে - চিন্তা করুন ও লিখুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান এক ধরনের মিতব্যয়িতা উপভোগ করে - সত্য/মিথ্যা
২. আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্য হচ্ছে প্রকৃতিগত - সত্য/মিথ্যা
৩. মুক্ত বাণিজ্য শ্রম বিভাগের উন্মেষ ঘটায় - সত্য/মিথ্যা
৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অনুপস্থিতিতে একচেটিয়ামূলক বাজারের উদ্ভব হয় - সত্য/মিথ্যা
৫. বাণিজ্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধির চালিকা-শক্তি - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা দিন।
২. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলতে কী বুঝায়? আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে এর পার্থক্য নির্দেশ করুন।
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তিসমূহ আলোচনা করুন।
৪. আন্তর্জতিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বিশেশুষণ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হচ্ছে
   ক. একটি দেশের দুটো আঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য
   খ. দুটো দেশের মধ্যে বাণিজ্য
   গ. ক ও খ উভয়ই
   ঘ. ক ও খ কোনটিই নয়।
২. আয়তনের মিতব্যয়িতার ফলে
   ক. মোট উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়
   খ. গড় উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়
   গ. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে
   ক. মুদ্রার বিভিন্নতা
   খ. বাণিজ্য নীতির বিভিন্নতা
   গ. প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্নতা
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৪. কোন্‌টি বাণিজ্য নীতির হাতিয়ার?
   ক. দ্রব্যের গুণগতমান
   খ. দ্রব্যের দাম
   গ. আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, কোটা প্রভৃতি
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
   ক. একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করে
   খ. অবাধ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে
   গ. একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে
   ঘ. উপরের কোনটিই সত্য নয়।

সমস্যা

ধরুন, বাংলাদেশের চাইতে ভারত কম খরচে ভাল মানের শাড়ী কাপড় উৎপাদন করতে সক্ষম। যদি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য বিরাজমান থাকে তাহলে বাংলাদেশে শাড়ী উৎপাদনে বিশেষায়ন সম্ভব হবে কি? চিন্তা করুন ও লিখুন।

পাঠ-২ আন্তর্জতিক বাণিজ্য তত্ত্ব (Theories of International Trade)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চরমসুবিধা তত্ত্ব এবং তুলনামূলক সুবিধাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- তত্ত্ব দুটো চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করতে পারবেন
- উদাহরণের সাহায্যে তত্ত্ব দুটোর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

অ্যাডাম স্মীথের æAn Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (১৭৭৬) বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ এবং বাণিজ্য থেকে লাভ-লোকসান (gains or losses from trade) ব্যাখ্যা ও বিশেণ্ডষণ করার জন্য বেশকিছু তত্ত্বের অবতারণা ঘটে। স্মীথের নিজের তত্ত্বটি চরম সুবিধাতত্ত্ব নামে পরিচিত। বলাবাহুল্য, বাণিজ্য থেকে প্রাপ্তব্য সুবিধা বা লাভ ব্যাখ্যা করার জন্য এটি প্রাচীনতম তত্ত্ব। এ পাঠে আমরা অ্যাডাম স্মীথের চরম সুবিধা তত্ত্ব এবং ডেভিড রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। এ দুটো তত্ত্বই ক্ল্যাসিক্যাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব নামে পরিচিত।

চরম সুবিধা তত্ত্ব (Theory of Absolute Advantage)

একটি ছোট্ট উদাহরণের সাহায্যে আমরা প্রথমে চরম সুবিধা তত্ত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করব। মনে করুন, আপনি প্রতি মিনিটে ৪০টি বাংলা শব্দ অথবা ৬০টি ইংরেজী শব্দ টাইপ করতে পারেন। আপনার সহকর্মী প্রতি মিনিটে ৫০টি বাংলা শব্দ অথবা ৫০টি ইংরেজী শব্দ টাইপ করতে পারেন। এ উদাহরণে, আপনার ইংরেজী টাইপিং-এ এবং আপনার সহকর্মীর বাংলা টাইপিং-এ চরম সুবিধা রয়েছে। এখন আপনি যদি শুধুমাত্র ইংরেজী টাইপিং এবং আপনার সহকর্মী শুধুমাত্র বাংলা টাইপিং -এর কাজ সম্পন্ন করে থাকেন তাহলে প্রতি মিনিটে দু'জনে মিলে ৬০ টি ইংরেজী শব্দ এবং ৫০ টি বাংলা শব্দ টাইপ করতে পারবেন। বিপরীতভাবে, আপনাদের প্রতি মিনিটের উৎপাদন ৪০ টি বাংলা শব্দ এবং ৫০ টি ইংরেজী শব্দ। এখন মনে করুন, আপনারা দু'জই উভয় প্রকার টাইপিং পালাক্রমে সম্পন্ন করতে চান। এক্ষেত্রে প্রতি মিনিটে আপনাদের গড় টাইপিং -এর হার হবে $\frac{৬০+৫০}{২}$ = ৫৫ টি ইংরেজী শব্দ এবং $\frac{৪০+৫০}{২}$ = ৪৫ টি বাংলা শব্দ। এ উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, আপনারা যদি 'চরম-সুবিধার' ধারণাটি মেনে চলেন তবে, আপনাদের প্রতি মিনিটের টাইপিং গতি সর্বোচ্চ হবে।

চরম সুবিধার উপর্যুক্ত ধারণাটি ব্যবহার করে এখন আমরা অ্যাডাম স্মীথ প্রদত্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চরম সুবিধা তত্ত্বটি আলোচনা করব। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, দুটো দেশের মধ্যে তখনই বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে যদি একটি দেশ কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদন অন্য দেশটির চেয়ে কম খরচে উৎপাদন করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, একই পরিমাণ শ্রম ব্যবহার করে যদি একটি দেশ অন্যটির তুলনায় কোন একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে তাহলে দুটো দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হবে এবং এ বাণিজ্য উভয়ের জন্য লাভজনক। নিচের সারণীটি লক্ষ্য করুন। সারণীতে ক এবং খ দুটো দেশ। ক-দেশে প্রতি মণ ধান উৎপাদন করতে ২০ ঘন্টা এবং প্রতি মণ পাট উৎপাদন করতে ৪০ ঘন্টা শ্রমের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে খ-দেশ প্রতি মণ ধান উৎপাদন করতে ৩৫ ঘন্টা এবং প্রতি মণ পাট উৎপাদন করতে ১৫ ঘন্টা শ্রম ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং শ্রম-ব্যবহারের ভিত্তিতে ক-দেশের ধান উৎপাদনে চরম সুবিধা রয়েছে। কারণ ক-দেশ খ-অপেক্ষা ১৫ ঘন্টা কম শ্রম ব্যবহার করে একই পরিমাণ ধান উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে, খ-দেশের চরম সুবিধা রয়েছে পাট উৎপাদনে (কীভাবে?)।

সারণী ৮.১: প্রতি মণ ধান ও পাটের উৎপাদন খরচ (শ্রম ঘন্টায়)

দেশ	ধান	পাট
ক	২০	৪০
খ	৩৫	১৫

সুতরাং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চরম সুবিধা তত্ত্ব অনুযয়ী, ক-দেশ ধান উৎপাদনে এবং খ-দেশ পাট উৎপাদনে বিশেষায়ন করবে। অর্থাৎ ক-দেশ ধান রপ্তানি করে পাট আমদানি বা সংগ্রহ করবে এবং খ-দেশ পাট রপ্তানি করে ধান সংগ্রহ করবে। ঠিক একই রকম বক্তব্য প্রকাশ করা যায় যদি আমরা শ্রমের একক প্রতি উৎপাদনের তুলনা করি। সারণী ৮.২ -এ তা দেখানো হলো। সারণী ৮.২ অনুযায়ী ক-দেশ একজন শ্রমিক (মনে করুন একজন শ্রমিকের ১০০ ঘন্টার শ্রম) ব্যবহার করে ১০ মণ ধান অথবা ৫ মণ পাট উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে, একই পরিমাণ শ্রম

সারণী ৮.২: শ্রমের এককপ্রতি উৎপাদন

দেশ	ধান	পাট
ক	১০ মণ	৫ মণ
খ	৫ মণ	১০ মণ

ব্যবহার করে খ-দেশ ৫ মণ ধান অথবা ১০ মণ পাট উৎপাদন করতে পারে। সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে, ক-দেশের ধান উৎপাদনে এবং খ-দেশের পাট উৎপাদনে চরম সুবিধা রয়েছে। সুতরাং বাণিজ্যে অবতীর্ণ হলে ক-দেশ ধান রপ্তানি করবে এবং খ-দেশ পাট রপ্তানি করবে। ক-দেশ ধানের বিনিময়ে পাট আমদানি করবে এবং খ-দেশ পাটের বিনিময়ে ধান আমদানি করবে।

অনুশীলন

বাংলাদেশ কম খরচে বস্ত্র উৎপাদন করতে সক্ষম এবং ভারত কম খরচে চিনি উৎপাদনে সক্ষম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য হলে বাংলাদেশ কোন দ্রব্যটি রপ্তানি করবে এবং কোন্‌টি আমদানি করবে? লিখুন।

তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব (Theory of Comporative Advantage)

চরম সুবিধা তত্ত্বের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, অর্থবহ বা লাভজনক বাণিজ্যের জন্য কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে কোন দেশের চরম সুবিধা থাকা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রতিটি দেশের এ ধরনের সুবিধা থাকতে হবে। অন্যদিকে কোন দেশের যদি প্রতিটি দ্রব্য উৎপাদনে চরম অসুবিধা বিদ্যমান থাকে তাহলে দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। মনে করুন, যুক্তরাষ্টেথর শ্রমিকগণ পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রমিকদের চেয়ে অধিকতর দক্ষ। চরম সুবিধাতত্ত্ব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্টথ শুধুমাত্র দ্রব্য রপ্তানিই করবে। কোন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করবে না। আমাদের কাল্পনিক উদাহরণে মনে করুন, আপনি ইংরেজী এবং বাংলা উভয় প্রকার টাইপিং -এ আপনার সহকর্মীর চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন। এর অর্থ কি এই যে, আপনিই শুধু টাইপিং -এর কাজ করবেন আর আপনার সহকর্মী অলসভাবে বসে থাকবেন? প্রদত্ত উদাহরণে মনে করুন, আপনার ইংরেজী ও বাংলা টাইপিং -এর গতি যথাক্রমে ৬০ ও ৫৫ শব্দ এবং আপনার সহকর্মীর যথাক্রমে ৪৫ ও ৫০ শব্দ। অর্থাৎ আপনার সহকর্মীর উভয় প্রকার টাইপিং -এ চরম অসুবিধা রয়েছে। কিন্তু বাংলা টাইপিং -এ তিনি তুলনামূলকভাবে অধিক দক্ষ। এই তুলনামূলক দক্ষতা বা অদক্ষতাই তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের ভিত্তি। তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি দেশ এমন দ্রব্য উৎপাদন এবং রপ্তানি করবে যে দ্রব্য উৎপাদনে দেশটির তুলনামূলক খরচ-সুবিধা রয়েছে অথবা যে দ্রব্য উৎপাদনে দেশটির খরচ-অসুবিধা তুলনামূলকভাবে

তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব বিশেওষণে যে উদাহরণটি বহুল ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ: মনে করুন, মিঃ সারোয়ার একজন নগর-সেরা আইনজীবি এবং তিনি একজন নগর-সেরা টাইপিষ্টও বটে। তাহলে তিনি কি তাঁর আইন-সংক্রান্ত লেখাগুলো নিজেই টাইপ করবেন নাকি টাইপিং-এর দায়িত্ব তাঁর সেক্রেটারীর হাতে ছেড়ে দেবেন। সেক্রেটারী একজন দক্ষ টাইপিষ্ট কিন্তু তিনি তো আর আইন সংক্রান্ত গবেষণা সম্পাদন করতে পারবেন না! সুতরাং, এক্ষেত্রে মিঃ সারোয়ার গবেষণা করবেন (যদিও টাইপিং-কাজেও তাঁর চরম সুবিধা রয়েছে) আর টাইপিং -এর কাজটি তাঁর সেক্রেটারীর উপর ছেড়ে দেবেন। সেক্রেটারীর দৃষ্টিকোন থেকে, টাইপিং -এ তাঁর তুলনামূলক অসুবিধা কম।

কম। তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের ধারণাটি নিচের সারণীতে (সারণী ৮.৩) প্রদত্ত তথ্যের সাহায্যে আরও পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সারণীতে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ক-দেশে প্রতি মণ ধান উৎপাদন করতে ৪০ ঘন্টা এবং প্রতি মণ পাট উৎপাদন করতে ৪৫ ঘন্টা শ্রমের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, খ-দেশে প্রতি মণ ধান ও পাট উৎপাদন করতে যথাক্রমে ৬০ ও ৫৫ ঘন্টা শ্রম ব্যবহার করতে হয়। স্পষ্টতঃই ক-দেশের ধান এবং পাট উভয় দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা রয়েছে। তবে ধান উৎপাদনের সুবিধা পাট উৎপাদনের সুবিধার চেয়ে বেশী। অর্থাৎ যদিও ক-দেশে দুটো দ্রব্যই খ-অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতার সাথে উৎপাদন করতে পারে তথাপি ধান উৎপাদনের তুলনামূলক সুবিধা বেশী। লক্ষ্য করুন, $\frac{৪০}{৬০} < \frac{৪৫}{৫৫}$। অন্যভাবে, $\frac{৬০}{৪০} > \frac{৪৫}{৫৫}$। এর অর্থ হচ্ছে, ক-দেশের প্রতি জন ধান-শ্রমিক খ-দেশের ১.৫ জন ধান-শ্রমিকের সমান উৎপাদন করতে পারে। অন্যদিকে, ক-দেশের একজন পাট-শ্রমিক খ-দেশের ১.২ জন পাট-শ্রমিকের সমান দক্ষ। বিপরীতভাবে, খ-দেশের ধান ও পাট উভয় দ্রব্য উৎপাদনে চরম অসুবিধা বিদ্যমান। তবে পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ- অসুবিধার মাত্রা কম। অর্থাৎ, খ-দেশের ধান অপেক্ষা

সারণী ৮.৩: প্রতি মণ ধান ও পাট উৎপাদনের খরচ (শ্রম ঘন্টা)

দেশ	ধান	পাট
ক	৪০	৪৫
খ	৬০	৫৫

পাট উৎপাদনে তুলনামুলক সুবিধা বিদ্যমান। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী, ক-দেশ ধান উৎপাদনে এবং খ-দেশ পাট উৎপাদনে বিশেষায়ন করবে। অর্থাৎ বাণিজ্যে অবতীর্ণ হয়ে ক-দেশ ধান রপ্তানি করে পাট সংগ্রহ করবে এবং খ-দেশ পাট রপ্তানি করে ধান সংগ্রহ করবে।

নিচে চিত্রের সাহায্যে তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হলো। ধরা যাক্, ক দেশ এক বছরের শ্রম দ্বারা ৪০ মণ ধান অথবা ১০ লক্ষ মণ পাট, ধান ও পাটের কোন সমন্বয় উৎপাদন করতে পারে যা ক-দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা IJ (চিত্র ৮.১) দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। অন্যদিকে, খ দেশ ১ বছরের শ্রম দ্বারা ৫০ লক্ষ মণ ধান অথবা ৫০ লক্ষ মণ পাট অথবা ধান ও পাটের কোন সমন্বয় উৎপাদন করতে পারে যা খ-দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা MN (চিত্র ৮.১) দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে।

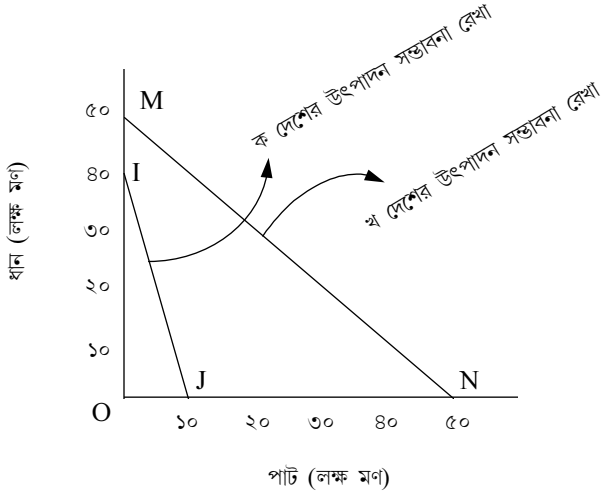

চিত্র ৮.১: দুটো দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ক দেশের ধান ও পাট উভয় দ্রব্য উৎপাদনে চরম অসুবিধা ও খ দেশের ধান ও পাট উভয় দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা রয়েছে। এমতাবস্থায়ও, ক ও খ দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে এবং তাতে উভয় দেশই লাভবান হবে। যেমন - খ দেশ ক দেশ অপেক্ষা ৫ গুণ পাট উৎপাদনে সক্ষম (চিত্র ৮.১ এর J ও N বিন্দুর মধ্যে তুলনা করুন) অথচ ক দেশের চাইতে শুধুমাত্র ২৫% ধান বেশী ধান উৎপাদনে সক্ষম (চিত্র ৮.১ এর I ও M বিন্দুর মধ্যে তুলনা করুন)। এ পার্থক্যটা দুটো দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢালের মাধ্যমেও দেখানো যায়। ক - দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল = OI/OJ = ৪০/১০ = ৪ - এর অর্থ হচ্ছে ক দেশ যদি পাট উৎপাদন ১মণ হ্রাস করে তাহলে তার ধান উৎপাদন ৪ মণ বৃদ্ধি পাবে। অতএব, ক দেশের এক মণ ধানের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে ৪ মণ পাট। খ দেশের ক্ষেত্রে, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ঢাল = OM/ON = ৫০/৫০ = ১ - এর অর্থ হচ্ছে খ দেশ এক মণ ধান উৎপাদন হ্রাস করলে ১ মণ পাট উৎপাদন বাড়াতে পারে মাত্র। অতএব, খ দেশের এক মণ ধানের সুযোগ ব্যয় হচ্ছে ১ মণ পাট।

যেহেতু দুটো দেশের সুযোগব্যয় ভিন্ন তাই দুটো দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হলে উভয় দেশই লাভবান হবে। তবে কে কতটুকু লাভবান হবে তা নির্ভর করে বিশ্ব বাণিজ্যে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে সৃষ্ট ধান ও পাটের তুলনামূলক দামের উপর। কিন্তু বিশ্ব বাজারে ১ মণ ধানের দাম যদি ১ মণ পাটের দামের বেশী এবং ৪ মণ পাটের দামের কম না হয়, তাহলে ক ও খ দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে না। কেননা যদি ১ মণ ধান দিয়ে ১ মণের বেশী পাট না পাওয়া যায় তাহলে খ দেশ নিজেই পাট উৎপাদন করবে - ক দেশ থেকে আমদানী করবে না। আমদানি করলে খ দেশের লোকসান হবে। কারণ খ দেশ নিজ দেশে উৎপাদন করলে ১ মণ ধানের পরিবর্তে ১ মণ পাট উৎপাদন করতে সক্ষম।

এখন ধারা যাক্, বিশ্ব বাণিজ্যে ধান ও পাটের বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে ২:১, অর্থাৎ ১ মণ পাট দিয়ে ২ মণ ধান পাওয়া যায়। এমতাবস্থায়, ক ও খ দেশের মধ্যে বাণিজ্য হলে উভয়েই লাভবান হবে। কীভাবে?

চিত্র ৮.২ এ বিষয়টি দেখানো হলো। চিত্র ৮.২ এর ১ম অংশে ক দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা IJ এবং ২য় অংশে খ দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা MN দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে (চিত্র ৮.১ এর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাদ্বয়ের অনুরূপ)। এখন যেহেতু বিশ্ব বাজারে ধান ও পাটের বিনিময় হার ২:১, সেহেতু খ দেশ ক দেশ থেকে ১ মণ পাট দিয়ে ২ মন ধান ক্রয় করতে পারবে অথচ নিজ

দেশে ১ মণ পাট উৎপাদনের খরচ ১ মণ ধান উৎপাদনের খরচের সমান। কাজেই খ দেশের জন্য ধান আমদানি করা লাভজনক। এজন্য খ দেশ শুধুমাত্র পাট উৎপাদনে বিশেষায়ন করবে এবং ধান আমদানি করবে।

অন্যদিকে, ক দেশ খ দেশ থেকে ১ মণ ধান দিয়ে $\frac{১}{২}$ মণ পাট ক্রয় করতে পারে অথচ নিজ দেশে ১ মণ ধান উৎপাদনের খরচ $\frac{১}{৪}$ মণ পাট উৎপাদনের খরচের সমান অর্থাৎ ১ মণ পাট উৎপাদন হ্রাস করে ৪ মণ ধান উৎপাদন করা যায় (১ মণ পাট উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় = ৪ মণ ধান)। কাজেই ক দেশের জন্য নিজ দেশে পাট উৎপাদন না করে খ দেশ থেকে পাট আমদানি করা লাভজনক। তাই ক দেশ শুধুমাত্র ধান উৎপাদনে বিশেষায়ন করবে এবং পাট আমদানি করবে। এর ফলে ক ও খ উভয় দেশের ভোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। চিত্র ৮.২ এ তা দেখানো হলো।

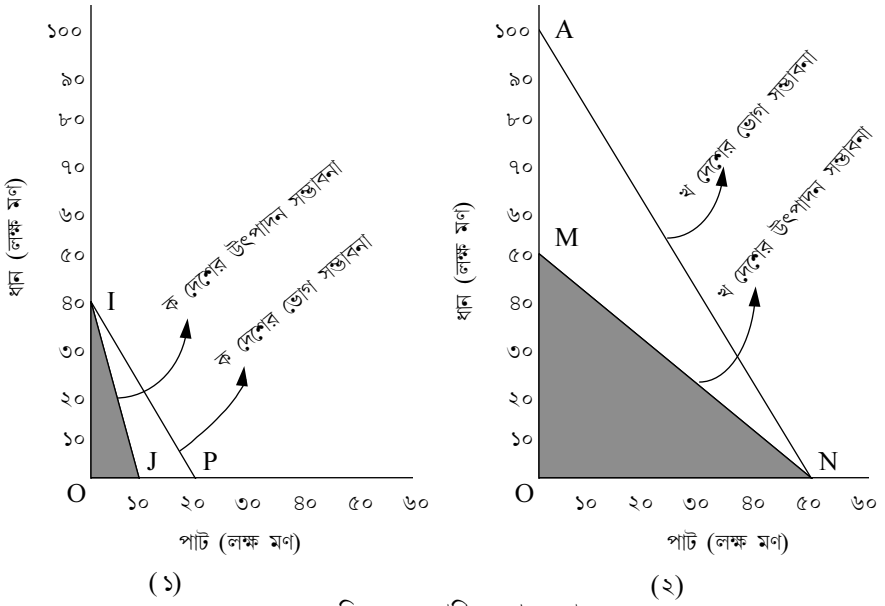

চিত্র ৮.২: বাণিজ্য থেকে লাভ

চিত্র ৮.২ এ ও IP ও AN হচ্ছে যথাক্রমে ক দেশ ও খ দেশের ভোগ সম্ভাবনা রেখা। দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশেরই ভোগ সম্ভাবনা সম্প্রসারিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে জানতে পারলেন যে, দুটো দেশের একটিতে নির্দিষ্ট দুটো দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা এবং অন্যটিতে একই দ্রব্য উৎপাদনে চরম অসুবিধা থাকলেও দেশ দুটোর মধ্যে লাভজনক বাণিজ্য সংঘটিত হতে পারে।

রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বটি নিম্নোক্ত অনুমিতিগুলোর উপর নির্ভরশীল:

১. শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ।

২. সব ধরনের শ্রম বা শ্রমিক সমজাতীয়।

৩. দেশের অভ্যন্তরে শ্রমের পূর্ণ গতিশীলতা রয়েছে কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম সম্পূর্ণরূপে গতিহীন।

৪. দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের প্রকৃত খরচ দ্বারা।

এছাড়াও আরও কিছু অনুমিতি এই তত্ত্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত তবে, ঐসব শর্ত বা অনুমিতি রিকার্ডোর তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের জন্য অপরিহার্য নয়।

● পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১. চরম সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী, লাভজনক বাণিজ্যের জন্য একটি দ্রব্য উৎপাদনে কোন দেশের চরম সুবিধা থাকতে হবে - সত্য/মিথ্যা

২. তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুসারে, সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে চরম সুবিধা থাকলে কোন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করবে না - সত্য/মিথ্যা

৩. তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বে তুলনামূলক খরচ সুবিধাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের চরম সুবিধা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

২. বিকার্ডোর তুলনামূলক খরচ তত্ত্বটি বিশেওষণ করুন। তত্ত্বটি কী কী অনুমিতির উপর নির্ভরশীল?

৩. এ্যাডাম স্মিথের চরম সুবিধা তত্ত্বটি থেকে রিকার্ডোর তুলনামূলক খরচ তত্ত্বটি কোন্ দিক থেকে ভিন্ন? ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. চরম সুবিধা তত্ত্বের প্রবক্তা

ক. জে.এম. কেইনস

খ. অ্যাডাম স্মীথ

গ. জে.এস. মিল

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. বাণিজ্য থেকে লাভ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাচীনতম তত্ত্ব কোন্‌টি?

ক. চরম সুবিধা তত্ত্ব

খ. তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব

গ. ক ও খ উভয়ই

ঘ. ক ও খ কোনটিই নয়।

৩. তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের প্রবক্তা

ক. অ্যাডাম স্মীথ

খ. জে.বি. সে

গ. জে.এম. কেইনস

ঘ. ডেভিড রিকার্ডো।

৪. তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বে অনুমান করা হয় যে,

ক. শ্রম সমজাতীয়

খ. উৎপাদন খরচ পরিবর্তনশীল

গ. বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রম গতিশীল

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

একক প্রতি খরচ (শ্রম ঘন্টায়)

দেশ	বস্ত্র	চিনি
বাংলাদেশ	৮০	৫০
শ্রীলংকা	১০০	৩০

ক. চরম সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী কোন্ দেশ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করবে?

খ. তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশ কোন্ দ্রব্য উৎপাদন করবে?

পাঠ-৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য (Balance of International Trade)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- লেনদেন ভারসাম্য, বাণিজ্যের ভারসাম্য ও বাণিজ্য শর্তের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন
- লেনদেন ভারসাম্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন
- লেনদেন ভারসাম্যের বিশেণ্ডষণে সমন্বয়কারী বিষয়সমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্য শর্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন
- উদাহরণের সাহায্যে বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

একটি দেশের সাথে অন্য সকল দেশের সামগ্রিক লেনদেনের নীট হিসাব সে দেশের অর্থনীতিকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। তাই একটি দেশের অর্থনীতির কার্যশীলতা বা পারফরমেন্স সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে সে দেশের সাথে বহির্বিশ্বের সকলপ্রকার লেনদেনের হিসাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক। এ পাঠে আমরা লেনদেন ভারসাম্য, বাণিজ্যের ভারসাম্য ও বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্য শর্ত সম্পর্কে জানব।

লেনদেন ভারসাম্য (Balance of Payments)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী একটি দেশ প্রতিবছর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রী এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মূলধন আমদানির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে একটি নির্দিষ্ট অংক প্রদান করে থাকে। একইভাবে, উল্লেখিত দ্রব্যসামগ্রী ও মূলধন বিনিময় করে দেশটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে। প্রতিটি দেশ বহির্বিশ্বের সাথে এ ধরনের লেনদেনের একটি সুবিন্যস্ত (systematic) হিসাব স্থিতিপত্র বা balance sheet -এর মাধ্যমে রাখে। স্থিতিপত্রের মাধ্যমে লেনদেনের হিসাবের সুবিন্যস্ত বর্ণনাকে লেনদেন ভারসাম্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, লেনদেন ভারসাম্য একটি দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক নির্দেশ করে। এখানে মুদ্রার চাহিদা বলতে বহির্বিশ্বকর্তৃক সংশিণ্ডষ্ট দেশটির রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থ, দেশটির বস্তুগত এবং আর্থিক মূলধনে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং দেশটির হস্তান্তর-পাওনা হিসেবে প্রাপ্ত অর্থকে বুঝানো হয়েছে। অন্যদিকে, মুদ্রার যোগান হচ্ছে বহির্বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ব্যয়, অন্য দেশের বস্তুগত ও আর্থিক মূলধনে বিনিয়োগকৃত অর্থ এবং হস্তান্তর প্রদানের যোগফল।

লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত

যদি বিদেশী মুদ্রার যোগান বিদেশ মুদ্রার চাহিদা অপেক্ষা কম হয় তাহলে লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা দিবে। অন্যভাবে, দ্রব্যসামগ্রী ও মূলধনের আমদানি ব্যয় এবং হস্তান্তর প্রদান দ্রব্যসামগ্রী ও মূলধনের রপ্তানি আয় এবং হস্তান্তর পাওনার চেয়ে বেশী হলে লেনদেনের ভারসাম্য ঘাটতি ভারসাম্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বিপরীতভাবে, লেনদেনের ভারসাম্যকে উদ্বৃত্ত ভারসাম্য বলা হয়।

লেনদেন ভারসাম্য হিসাবের উপাদানসমূহ

লেনদেন ভারসাম্যের সংজ্ঞাতেই আমরা এসব উপাদানের উল্লেখ করেছি। এ পর্যায়ে আমরা এসব উপাদানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান কবর।

চলতি হিসাব (Current Account): দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান উভয় প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনের বর্ণনা চলতি হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী যেমন, পাট, চা, চামড়া, খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রাংশ প্রভৃতিকে দৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রী বলা হয়। অন্যদিকে, ভ্রমণকারীর খরচ, বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-খরচ, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আয় প্রভৃতি সেবাধর্মী কাজের লেনদেনকে অদৃশ্যমান লেনদেন বলা হয়।

মূলধন হিসাব (Capital Account): মূলধন স্থানান্তরের মাধ্যমেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে লেনদেন সংঘটিত হতে পারে। স্থিতিপত্রে মূলধন লেনদেনের যে তথ্য সন্নিবেশিত হয় তা মূলধন হিসাব নামে অভিহিত। মূলধন স্বল্প ও দীর্ঘ উভয় মেয়াদী হতে পারে। বহির্বিশ্বের কোন কোম্পানীর শেয়ার বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রে বিনিয়োগ অথবা বিদেশে কারখানা স্থাপন প্রভৃতি দীর্ঘ-মেয়াদী মূলধন হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে তরল সম্পদ (liquid assets) যেমন- অন্য দেশের ব্যাংকে রক্ষিত তহবিল, স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ প্রভৃতি হস্তান্তর বা স্থানান্তরকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন বলা হয়। মূলধনের লেনদেন দুটো দেশের সরকারের মধ্যে অথবা সরকার ও অন্যান্য দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অথবা দুটো দেশের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংঘটিত হতে পারে।

সমন্বয়কারী বিষয়সমূহ (Balancing Items): এটা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, লেনদেনের ভারসাম্য সবসময় স্থিতাবস্থায় থাকে (Balance of payments always balances)। এর অর্থ এই নয় যে, একটি দেশের চলতি হিসাবে ঘাটতি (উদ্বৃত্ত) থাকলে মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত (ঘাটতি) দ্বারা তা সমন্বয় (balance) করা হয়। একটি দেশের চলতি এবং মূলধন উভয় হিসাবে ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত থাকতে পারে তথাপি লেনদেনের ভারসাম্যে স্থিতি দেখানো হয়। মনে করুন, একটি পরিবারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। এটা কীভাবে সম্ভব? এক্ষেত্রে বুঝতে হবে পরিবারটি ঋণের মাধ্যমে অতিরিক্ত খরচের যোগান দিচ্ছে। একই কথা আর্ন্তজাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও সত্য। একটি দেশের চলতি ও মূলধন হিসাবের ঘাটতি নির্দেশ করে যে, দেশটি সরকারী বা বেসরকারী বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করেছে। বিপরীতভাবে, চলতি ও মূলধন হিসাবের উদ্বৃত্ত নির্দেশ করে যে, দেশটি হয় অন্য কোন দেশ বা বহির্বিশ্বকে ঋণ প্রদান করছে অথবা উদ্বৃত্ত অর্থ দেশটির বৈদেশিক মুদ্রার মজুদে সংযোজিত হয়েছে। ঋণ-প্রদান বা ঋণ-গ্রহণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা-মজুদের পরিবর্তন এক্ষেত্রে সমন্বয়কারী উপাদান বা balancing items হিসেবে বিবেচ্য।

বাণিজ্যের ভারসাম্য (Balance of Trade)

একটি দেশের শুধুমাত্র দৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি ও আমদানির হিসাব বা সুবিন্যস্ত তথ্যকে বাণিজ্যের ভারসাম্য বলা হয়। লেনদেন ভারসাম্যের সাথে বাণিজ্যের ভারসাম্যের পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রথমত: বাণিজ্যের ভারসাম্য শুধুমাত্র দৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদানের হিসাব নির্দেশ করে। লেনদেন ভারসাম্য দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান উভয়প্রকার দ্রব্যসামগ্রী এবং মূলধনের আদান-প্রদানের সুবিন্যস্ত হিসাব। বস্তুতঃ বাণিজ্যের ভারসাম্য লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবের একটি অংশ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ লেনদেন ভারসাম্য সবসময় স্থিতাবস্থায় থাকে। কিন্তু বাণিজ্যের ভারসাম্যে স্থিতি, ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত যে কোন অবস্থা বিদ্যমান থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বাণিজ্যের ভারসাম্যে স্থিতাবস্থার ধারণা করা কঠিন।

বাণিজ্যর শর্ত (Terms of Trade)

দেশের নীতি নির্ধারকদের নিকট বাণিজ্য শর্ত একটি বহুল আলোচিত ধারণা। একটি দেশের লেনদেন ভারসাম্য বিশেণ্ডষণের ক্ষেত্রে বাণিজ্য শর্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য। সাধারণভাবে বাণিজ্য শর্ত বলতে এক একক রপ্তানি দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা যায় অথবা এক একক আমদানি দ্রব্যের জন্য যতটুকু রপ্তানি দ্রব্য ছাড়তে হয় তার পরিমাণকে বুঝায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত এ ধারণাটিকে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। বর্তমান আলোচনায় আমরা উল্লেখযোগ্য প্রকারভেদগুলো ব্যাখ্যা করব। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি সংজ্ঞা বা প্রকারভেদের মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্য থেকে প্রাপ্তব্য লাভ-লোকসান হিসেব করা।

নীট বার্টার বাণিজ্য শর্ত (Net Barter Terms of Trade): নীট বার্টার বাণিজ্য শর্ত বা দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত হচ্ছে দ্রব্যের রপ্তানি মূল্য ও আমদানি মূল্যের অনুপাত। একাধিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি ও আমদানি মূল্য বলতে যথাক্রমে একটি দেশের রপ্তানি দ্রব্যের সাধারণ মূল্যস্তর বা রপ্তানি মূল্য সূচক এবং আমদানি দ্রব্যের সাধারণ মূল্যস্তর বা আমদানি মূল্য সূচককে বুঝানো হয়ে থাকে। মনে করি, Px = রপ্তানি মূল্য সূচক এবং Pm = আমদানি মূল্য সূচক। সুতরাং দ্রব্য বাণিজ্য শর্তকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$Tc = \frac{Px}{Pm}$$

যেখানে Tc = Commodity Terms of Trade বা দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত।

দ্রব্য বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন দ্বারা আমরা সময়ের ব্যবধানে একটি দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ রপ্তানির গুরুত্ব আমদানি দ্রব্যের নিরিখে বিচার করতে পারি। নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে সময়ের ব্যবধানে দ্রব্য বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়:

$$\Delta Tc = \frac{Px_1 / Pm_1}{Px_0 / Pm_0} = \frac{Px_1}{Pm_1} \times \frac{Pm_0}{Px_0}$$

যেখানে ΔTc = দ্রব্য বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন

Px_1 = বর্তমান বছরের রপ্তানি মূল্য সূচক

Pm_1 = বর্তমান বছরের আমদানি মূল্য সূচক

Px_0 = পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি মূল্য সূচক এবং

Pm_0 = পূর্ববর্তী বছরের আমদানি মূল্য সূচক।

মনে করুন, ১৯৮০ সাল হচ্ছে ভিত্তি বছর। অর্থাৎ ১৯৮০ সালে রপ্তানি ও আমদানি মূল্য সূচক = ১০০। এখন মনে করুন, ১৯৯০ সালে রপ্তানি মূল্য সূচক = ১৮০ এবং আমদানি মূল্য সূচক = ১৪০। সুতরাং,

$$\Delta Tc = \frac{১৮০}{১৪০} \cdot \frac{১০০}{১০০} = ১.২৯$$

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ১৯৮০ সালের তুলনায় ১৯৯০ সালে নীট বার্টার বাণিজ্য শর্ত বা দ্রব্য বাণিজ্য শর্তের ২৯% উন্নয়ন ঘটেছে। অন্যভাবে বলা যায়, একই পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করে ১৯৮০ সালের তুলনায় ১৯৯০ সালে ২৯% বেশী দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব।

মোট বার্টার বাণিজ্য শর্ত (Gross Barter Terms of Trade): মোট বার্টার বাণিজ্য শর্ত বলতে একটি দেশের একটি নির্দিষ্ট বছরে আমদানিকৃত দ্রব্যের মোট বস্তুগত পরিমাণ এবং রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মোট বস্তুগত পরিমাণের অনুপাতকে বুঝানো হয়। সাংকেতিকভাবে, মোট বার্টার বাণিজ্য শর্ত (Tg) -কে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$Tg = \frac{Qm}{Qx}$$

যেখানে Qm = আমদানি দ্রব্যের মোট বস্তুগত পরিমাণ এবং Qx = রপ্তানি দ্রব্যের মোট বস্তুগত পরিমাণ। Tg দ্বারা বুঝানো হয় এক একক রপ্তানি দ্রব্য গড়ে কত একক দ্রব্য আমদানি করতে পারে। Tg>1 অনুকূল বাণিজ্য শর্তের নির্দেশক। নীট বার্টার বাণিজ্য শর্তের মতো নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করে আমরা সময়ের ব্যবধানে মোট বার্টার বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারি:

$$\Delta Tg = \frac{Qm_1 / Qx_1}{Qm_0 / Qx_0} = \frac{Qm_1}{Qx_1} \cdot \frac{Qx_0}{Qm_0}$$

আয় বাণিজ্য শর্ত (Income Terms of Trade): আয় বাণিজ্য শর্ত হলো একটি নির্দিষ্ট বছরের মোট রপ্তানি আয় এবং আমদানির মূল্য সূচকের অনুপাত। মনে করি, Px = রপ্তানি মূল্য সূচক এবং Qx = মোট রপ্তানির পরিমাণ। কাজেই মোট রপ্তানি আয় = Px Qx। সুতরাং আয় বাণিজ্য শর্তকে নিমোক্তাভাবে প্রকাশ করা যায়:

Ti (আয় বাণিজ্য শর্ত) = $\frac{PxQx}{Pm}$ যেখানে Pm = আমদানি মূল্য সূচক।

নীট বার্টার বাণিজ্য শর্তের সাথে আয় বাণিজ্য শর্তের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মনে করুন, Px বেড়েছে। যদি Pm স্থির থাকে তাহলে নীট বার্টার বাণিজ্য শর্তের $\left(\frac{Px}{Pm}\right)$ উন্নয়ন ঘটবে। এখন মনে করুন, Px যে হারে বেড়েছে Qx ঠিক একই হারে কমেছে। তাহলে আয় বাণিজ্য শর্তের কোনরূপ পরিবর্তন হবে না। Qx যদি Px -এর চেয়ে বেশী হারে কমে তাহলে প্রকৃতপক্ষে আয় বাণিজ্য শর্তের অবনতি ঘটবে। কাজেই বলা যায়, নীট বার্টার বাণিজ্য শর্তের উন্নয়ন সবসময় আয় বাণিজ্য শর্তের উন্নয়ন নির্দেশ করে না। উক্তিটি বিপরীতভাবেও সত্য।

অনুশীলন

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জীটি হাতের কাছে নিন। গত অর্থবছর ও পাঁচ বৎসর পূর্বের এবং রপ্তানি ও আমদানি মূল্য সূচক বের করুন। পাঁচ বৎসর পূর্বের তুলনায় গত অর্থবছরে নীট বার্টার বাণিজ্য শর্তের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে? লিখুন।

● পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা

১. বাণিজ্যের ভারসাম্য সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা বিবেচনা করে - সত্য/মিথ্যা
২. চলতি হিসাবে শুধুমাত্র দৃশ্যমান দ্রব্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা হয় - সত্য/মিথ্যা
৩. লেনদেন ভারসাম্য সবসময় স্থিতাবস্থায় থাকে - সত্য/মিথ্যা
৪. লেনদেন ভারসাম্য একটি দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের সম্পর্ক নির্দেশ করে - সত্য/মিথ্যা
৫. আমদানি মূল্য সূচককে রপ্তানি মূল্য সূচক দ্বারা ভাগ করে নীট বার্টার বাণিজ্য শর্ত পাওয়া যায় - সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লেনদেন ভারসাম্য বলতে কি বুঝায়?
২. বাণিজ্যের ভারসাম্য এর সংজ্ঞা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. লেনদেন ভারসাম্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্যের পার্থক্য নির্ণয় করুন।
২. লেনদেন ভারসাম্য সবসময় স্থিতাবস্থায় থাকে - ব্যাখ্যা করুন।
৩. লেনদেন ভারসাম্য হিসাবের উপাদানগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৪. বাণিজ্য শর্ত বলতে কী বুঝায়? বিভিন্ন প্রকার বাণিজ্য শর্তের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা দিবে যদি
   ক. চলতি হিসাবে ও মূলধন হিসাবে ঘাটতি থাকে
   খ. শুধুমাত্র চলতি হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয়
   গ. শুধুমাত্র মূলধন হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. কোন্‌টি চলতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত?
   ক. বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী
   খ. বর্হিবিশ্বের কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়
   গ. অন্য দেশের ব্যাংকে রক্ষিত তহবিল
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. কোন্‌টি মূলধন হিসাবের অন্তর্ভুক্ত?
   ক. পাট রপ্তানি
   খ. চা রপ্তানি
   গ. গুড়ো দুধ আমদানি
   ঘ. বিদেশে কারখানা স্থাপন।

৪. দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত নির্ভর করে
   ক. শুধু রপ্তানি মূল্য সূচকের উপর
   খ. শুধু আমদানি মূল্য সূচকের উপর
   গ. রপ্তানি মূল্য সূচক ও আমদানি মূল্য সূচক উভয়ের উপর
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৫. আমদানি মূল্য সূচক বৃদ্ধি পেলে
   ক. দ্রব্য বাণিজ্য শর্তের উন্নতি হবে
   খ. দ্রব্য বাণিজ্য শর্তের অবনতি ঘটবে
   গ. দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

নিচের সারণীটি বিবেচনা করুন -

বছর	Px	Pm	Qx	Qm
১৯৮৫	১০০	১০০	২০০	৩০০
১৯৯০	১১০	১২০	৩০০	৩৫০
১৯৯৫	১২০	১৪০	৩৫০	৪০০

ক. বিভিন্ন বছরের নীট বার্টার বাণিজ্য শর্ত, মোট বার্টার বাণিজ্য শর্ত ও আয় বাণিজ্য শর্ত পরিমাপ করুন।

খ. ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৯০ সালে নীট বার্টার বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন পরিমাপ করুন।

গ. ১৯৯০ সালের তুলনায় ১৯৯৫ সালে মোট বার্টার বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন পরিমাপ করুন।

পাঠ-৪ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি (Trends of International Trade of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রীর বিবরণ দিতে পারবেন
- আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের কাঠামোগত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য ও বাণিজ্যের শর্ত সম্পর্কে বলতে পারবেন
- সার্বিকভাবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিধারা বিশেশুষণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

স্বল্প পরিসরে একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি বিশেশুষণ একটি অত্যন্ত দূরুহ কাজ। এ পাঠে আমরা তাই চেষ্টা করব বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রকৃতি এবং সময়ের ব্যবধানে এর পরিবর্তনের ধারার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তোলে ধরতে। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আমরা বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করবঃ

১. প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রী
২. আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের কাঠামোগত পরিবর্তন
৩. বাণিজ্যের ভারসাম্য ও বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন

প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রী

আমদানি দ্রব্যসামগ্রীঃ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য-সামগ্রী এবং ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে এসব দ্রব্যের উপর ব্যয়ের হিসাব নিচের সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী -৮.৪ঃ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্য

আমদানি দ্রব্য	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন টাকা)	
	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য	৩২৯৯	২৯০৬
চিনি	১৭৩৪	১৪৩৩
চাল	৩২৫	২২৬৩
গম	৯১০৫	৪৯২৪
কাঁচা তুলা	২৪৯৩	৩৮৪৬
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৪৪৬১	১০৫০০
পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৬৯৪৯	৭২০০
সার	২৬৯৪	১৭০৪
সিমেন্ট	২৬৩৫	৩১২৯
সব্জিজাত পরিশোধিত তৈল	৫১৩৮	৪৪২৮
লৌহ ও ইস্পাত	৭০১৯	৫৮৩৫
পাকানো সুতা	২৫৯৭	৩৩২৫
বস্ত্র (Fabrics)	৬১০৩	৯১৭৯
যন্ত্রপাতি (বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ)	১০২৪৭	১৬১৪২
যানবাহন	২৮২৪	৩১০৩
উৎসঃ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড স্ট্যটিস্টিক্স - ১৯৮৯/৯০, পৃঃ VIII.		

উপরে উল্লিখিত দ্রব্য সামগ্রীর মোট আমদানি ব্যয় উল্লিখিত বছর দুটোর মোট আমদানি ব্যয়ের যথাক্রমে ৭১.১২% ও ৭০.৫৩%। উপরের সারণীটি বিশেশুষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, বাংলাদেশের আমদানি দ্রব্যসামগ্রীর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ভোগ্য দ্রব্য অথবা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য এয়োজনীয় কাঁচামাল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত এ চার বছরে মোট আমদানি ব্যয়ে উল্লিখিত দুই শ্রেণীর অংশ ছিল যথাক্রমে ৬৭.৫%, ৬৮.৬%, ৬৪.৭৬% এবং ৬৯.৪৬%। উল্লেখ্য যে, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা সাধারণতঃ অস্থিতিস্থাপক হয়ে থাকে অর্থাৎ দাম বাড়া বা কমার সাথে এসব দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের খুব একটা পরিবর্তন হয় না।

রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রী: নিচের সারণীতে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে এসব দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত রপ্তানি আয় দেখানো হলো।

সারণী ৮.৫: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য

রপ্তানি দ্রব্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন টাকা)	
	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০
মৎস ও অন্যান্য জলচর প্রানী	৫২৪১	৫৫৭১
চা	১২০৮	১২০১
ন্যাপথা	৩৮২	২৬০
চামড়া	৪৫১৪	৫৯৫৫
কাঁচা পাট	২৮১৩	৩৪৪৪
পাটের তৈরি সূতা	১২১৫	১৪৩১
পাট বস্ত্র (Jute Fabrics)	৩১৯৩	৫৩৪৪
পাটের থলে ও চট	৪৬৮৬	৩৭৫৫
তৈরি পোশাক	১৪৪৪৮	২১২৩৯
উৎস: পূর্বোক্ত, পৃ: VII.		

উপরে উল্লিখিত ৯টি প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য থেকে অর্জিত আয় ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের যথাক্রমে ৮৮.৩২% এবং ৯৩.৭৫%। আমদানি দ্রব্যের মতো বাংলাদেশের রপ্তনি দ্রব্যের বেশীর ভাগই ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের অথবা ভোগ্যদ্রব্য জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। ১৯৮৮-৮৯ থেকে ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ে উপরোক্ত দুই শ্রেণীর দ্রব্যসামগ্রীর অংশ ছিল যথাক্রমে ৯৬.৫%, ৯৮.৯৪%, ৯৮.০৪% এবং ৯৫.৮৮%।

অনুশীলন

গত অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানিদ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ ও প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ লিখুন এবং এসব তথ্যগুলোকে পূর্ববর্তী বছরগুলোর আমদানী ও রপ্তানীর পরিমানের সাথে তুলনা করুন।

আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের কাঠামোগত পরিবর্তন

আমদানি দ্রব্যসামগ্রী: সময়ের ব্যবধানে মোট আমদানি ব্যয়ে বিভিন্ন দ্রব্যের অংশ এবং আমদানি-সংমিশ্রণ (import-mix) বিশেশুষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যভাবে বলা যায়, সময়ের ব্যবধানে মোট আমদানি ব্যয়ে বিভিন্ন দ্রব্যের অংশের পরিবর্তন ঘটেছে - কোন কোন দ্রব্য অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করেছে, কোন কোন দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ কমেছে। এ অর্থে আমদানি সংমিশ্রণের কোন পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ ১০ বছর পূর্বে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি করা হতো ১০ বছর পরেও সে সকল দ্রব্য আমদানি করা হয়েছে বা হচ্ছে। অধিকন্তু আমদানি-সংমিশ্রণে কিছু কিছু দ্রব্যের নতুন সংযোজন হয়েছে। নতুনভাবে সংযোজিত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে এমন কিছু দ্রব্য রয়েছে যা এক সময়ে নীট রপ্তানি দ্রব্য হিসেবে বিবেচিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, পনির, চিনি, মশলা এবং অপরিশোধিত সারের উল্লেখ করা যায়।

বাংলাদেশে পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জীতে সন্নিবেশিত উপাত্তসমূহ ঘনিষ্টভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সময়ের ব্যবধানে খাদ্যসামগ্রী আমদানির হার বেড়েছে সবচেয়ে বেশী। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৬-৭৭ থেকে ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে চালের আমদানি বেড়েছে গড়ে ১৪.৩% হারে, গমের আমদানি বেড়েছে ৪১.৩% হারে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং চিনির আমদানি বেড়েছে যথাক্রমে ৬৯.৫% এবং ১৫২.১% হারে। মোট আমদানি ব্যয়ের অংশ হিসেবে একত্রে চাল ও গমের আমদানি বেড়েছে ১৩.৭৫%। ১৯৭৬-৭৭ সালে চাল ও গমের অংশ ছিল ৯.৬০%। ১৯৮৭-৮৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.৩৫%।

রপ্তানি দ্রব্যসামগ্রী: বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়া সীমিত সংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে গঠিত। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ (কোন কোন বছরে ৯০% -এরও বেশী) আসে শুধুমাত্র ৯ টি দ্রব্য থেকে। ঐতিহ্যবাহী দ্রব্যসামগ্রী যেমন - পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া প্রভৃতি যদিও রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, মোট রপ্তানি আয়ের অংশ হিসেবে এসব দ্রব্যের গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। এদের জায়গা দখল করেছে মৎস ও অন্যান্য জলচর প্রানী এবং বিশেষ করে তৈরি পোশাক উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭৬-৭৭ সালে মোট রপ্তানি আয়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অংশ ছিল ৬৯.১৭%, ১৯৮৭-৮৮ সালে তা কমে ২৬.০৫% -এ দাঁড়ায়। ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ সালে এ হার ছিল যথাক্রমে ২৭.৮৯% ও ২৭.২০%। পক্ষান্তরে, তৈরি পোশাকা রপ্তানি আয়ে অবদান রাখতে শুরু করে ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে যখন মোট রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাকের অংশ ছিল যথাক্রমে ৩৩.৮৫% এবং ৪১.৩১%। বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৬০% এরও বেশী আসে তৈরি পোশাক থেকে।

অনুশীলন

গত অর্থবছরে এবং এর পূর্ববর্তী অর্থবছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ সারণী ৮.৪ ও ৮.৫ এ বসান। উল্লেখিত সময়ে বাংলাদেশের আমাদনি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনরূপ কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে কিনা? লিখুন।

বাণিজ্যের ভারসাম্য ও বাণিজ্য শর্তের পরিবর্তন

বাংলাদেশের মোট আমদানি ব্যয় এবং মোট রপ্তানি আয়ের গতিধারা বিশেশুষণ করলে দেখা যায় যে, সময়ের ব্যবধানে আমদানি ব্যয় এবং রপ্তানি আয় দুই-ই বেড়ে চলেছে। কিন্তু আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির হার রপ্তানি আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশী। এর অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। সারণী ৮.৬ এ ১৯৭৮-৭৯ থেকে ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়, রপ্তানি আয় এবং বাণিজ্যের ভারসাম্যের হিসাব প্রদান করা হলো। সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে, ঘাটতির পরিমাণ দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মোটামুটিভাবে বর্ধমান।

সারণী ৮.৬: বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্য বা স্থিতি (মিলিয়ন টাকা)

বছর	রপ্তানি	আমদানি	স্থিতি
১৯৭৮-৭৯	৯৬৩২	২২০৭৩	-১২৪৪১
১৯৭৯-৮০	১০৯৯৭	৩০৫২৫	-১৯৫২৮
১৯৮০-৮১	১১৪৮৪	৩৭২৮৮	-২৫৮০৪
১৯৮১-৮২	১২৩৮৭	৩৮৭২৯	-২৬৩৪২
১৯৮২-৮৩	১৮০১৬	৪৫২৬৫	-২৭২৪৯
১৯৮৩-৮৪	২০১৩৬	৫০৮৭৪	-৩০৭৩৮
১৯৮৪-৮৫	২৬২২৫	৬৮২৬৩	-৪২০৩৮
১৯৮৫-৮৬	২৭৩৯৬	৬২৯২৯	-৩৫৫৩৩
১৯৮৬-৮৭	৩৩৬৮২	৬৮৪৯৬	-৩৪৮১৪
১৯৮৭-৮৮	৪১১৬১	৯১৫৮৮	-৫০৪২৭
১৯৮৮-৮৯	৪২৬৮৬	৯৫০৭৫	-৫২৩৮৯
১৯৮৯-৯০	৫১৪১৫	১১৩৩০৫	-৬১৮৯০
১৯৯০-৯১	৬০২৭২	১১১৮৭৭	-৫১৬০৫
১৯৯১-৯২	৭৪১৯৮	১৩২৭৫৬	-৫৮৫৫৮
উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৩১			

নিচের চিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের মোট আমদানি ব্যয়, রপ্তানি আয় এবং বাণিজ্যের ভারসাম্য ব্যাখ্যা করা হলো।

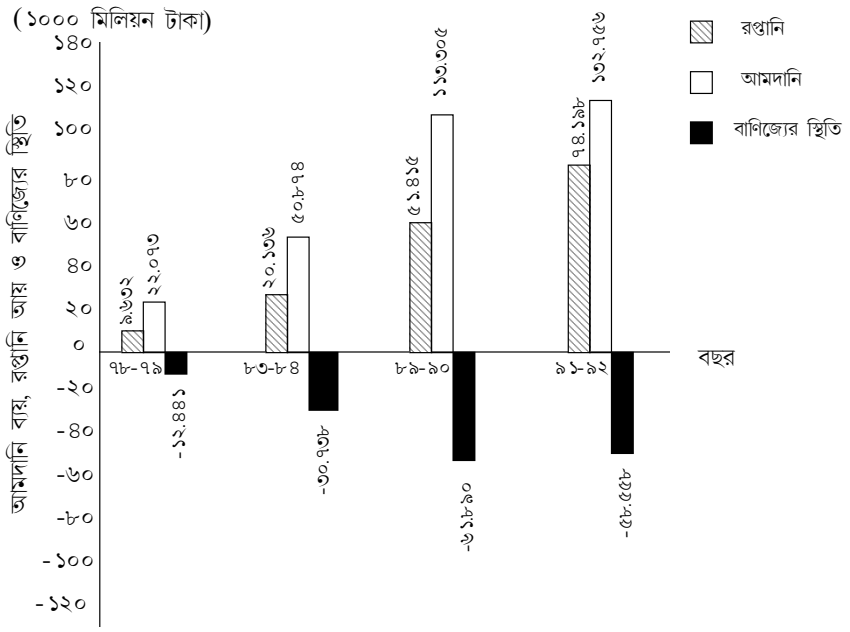

চিত্রঃ- ৭.৩: বাংলাদেশের আমদানি, রপ্তানি ও বাণিজ্যের স্থিতি

বাংলাদেশের বিভিন্ন বছরের রপ্তানি দাম সূচক ও আমদানি দাম সূচক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাধারণভাবে দুটো সূচকই উর্ধ্বগামী। তবে আমদানি দাম সূচকের বৃদ্ধির হার রপ্তানি দাম সূচক অপেক্ষা বেশী। ফলে বাংলাদেশের দ্রব্য বণিজ্য শর্ত সার্বিকভাবে অবনতিশীল। সারণী ৭.৭ -এ বাংলাদেশের ১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত সময়ের আমদানি দাম সূচক, রপ্তানি দাম সূচক এবং দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত দেখানো হলো।

সারণী ৭.৭: আমদানি দাম সূচক, রপ্তানি দাম সূচক এবং দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত

বছর	আমদানি দাম সূচক (ভিত্তি: ১৯৭৬-৭৭=১০০)	রপ্তানি দাম সূচক (ভিত্তি: ১৯৭৬-৭৭=১০০)	দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত
১৯৮৫-৮৬	২৪৬	২৫৭	১০৭
১৯৮৬-৮৭	২৫৯	২৩২	৯০
১৯৮৭-৮৮	২৭৮	২৫৯	৯৩
১৯৮৮-৮৯	২৩৮	২৮৭	১২১
১৯৮৯-৯০	২৭০	২৬৯	১০০
১৯৯০-৯১	৩৩৭	৩০২	৯০
১৯৯১-৯২	৩২৭	২৯৬	৯১
উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৩৭			

অনুশীলন

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জী, ১৯৯৭ হাতের কাছে নিন। ১৯৯৫-৯৬ ও ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের আমদানি দাম সূচক ও রপ্তানি দাম সূচক বের করুন এবং সারণী ৭.৭ এ বসান। ১৯৯৫-৯৬ সনের তুলনায় ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে দ্রব্য বাণিজ্য শর্তের কোন উন্নতি বা অবনতি হয়েছে কিনা? লিখুন।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. বাংলাদেশে ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি সবচেয়ে বেশী -সত্য/মিথ্যা

২ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে চা থেকে -সত্য/মিথ্যা

৩ বাংলাদেশের দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত অবনতিশীল -সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করুন।

২. কোন অর্থে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়ায় কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে?

৩. "বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অবনতিশীল" - আপনি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? ব্যাখ্যা করুন।

৪. বাংলাদেশের দ্রব্য বাণিজ্য শর্তের সাধারণ প্রবণতা বিশেণ্ডষণ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের আমদানি দ্রব্যগুলোর বড় অংশ জুড়ে রয়েছে

ক. ভোগ্য দ্রব্য

খ. যন্ত্রপাতি

গ. সিমেন্ট

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে

ক. চা থেকে

খ. চামড়া থেকে

গ. তৈরি পোশাক থেকে

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৩. বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় রপ্তানি ব্যয় থেকে

ক. বেশী

খ. কম

গ. সমান

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৪. ১৯৯০-৯১ সনে বাংলাদেশের দ্রব্য বাণিজ্য শর্ত ছিল

ক. ৯১

খ. ১০০

গ. ৯০

ঘ. ১২১

৫. বাংলাদেশের বাণিজ্যের স্থিতি সবসময়

ক. ধনাত্মক

খ. ঋণাত্মক

গ. শূন্য

ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

বাংলাদেশের পরিসংখ্যানে বর্ষপঞ্জী ১৯৯৭ হাতের কাছে নিন। ১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৬-৯৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ লক্ষ্য করুন। এ সময়ে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পেয়েছে এবং কোন্গুলোর আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে? লিখুন। রপ্তানি মিশ্রণে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে কি? মন্তব্য করুন।

পাঠ-৫ মুদ্রার অবমূল্যায়ন (Devaluation of Currency)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মুদ্রার মূল্য-হ্রাস, মূল্য-বৃদ্ধি, উর্ধ্বমূল্যায়ন এবং অবমূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারবেন
- মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- মুদ্রার অবমূল্যায়নের কার্যকারিতা এবং এর নির্ধারক বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

প্রত্যেক দেশের মুদ্রার একটি বিনিময় মূল্য রয়েছে, অর্থাৎ এক টাকা দিয়ে আপনি যা পাবেন তাই হবে ১ টাকার মূল্য। এবার যদি দেখেন এক টাকা দিয়ে আপনি কম জিনিস পাচ্ছেন তাহলে বলা হয় মুদ্রার দাম কমেছে। মুদ্রা প্রকৃ তঅর্থে অবমূল্যায়িত হয়েছে। এইভাবে মুদ্রার মূল্য বাড়ে ও কমে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মুদ্রার অবমূল্যায়ন একটি সাধারণ ঘটনা। অনুন্নত দেশগুলো তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি দূর করার জন্য সময়ে সময়ে বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশীয় মুদ্রার মানের সরকারী হার কমিয়ে পুনঃনির্ধারণ করে থাকে। যে কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার সরকারীভাবে হ্রাস করাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলা হয়। মুদ্রার অবমূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলো হলো যথাক্রমে মুদ্রার মূল্য হ্রাস (Depreciation), মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি (Appreciation) এবং সরকারীভাবে মুদ্রার বিনিময় হারের উর্ধ-মূল্যায়ন (Revaluation)। এ বিষয়গুলো ধারণাগতভাবে পৃথক। তথাপি, Depreciation ও Devaluation এবং Appreciation ও Revaluation -এর পার্থক্য মূলতঃ মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে লুক্কায়িত। মুদ্রার মূল্য সরকারীভাবে নির্ধারিত হচ্ছে নাকি মুদ্রা বিনিময় বাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে নির্ধারিত হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হবে। সাধারণতঃ যদি সরকারীভাবে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা হয় তাকে বলা হয় Devaluation এবং মুদ্রা বিনিময় বাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস পেলে তাকে বলা হয় Depreciation। অন্যদিকে, সরকারীভাবে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয় Revaluation এবং মুদ্রা বিনিময় বাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে মুদ্রার মুল্য বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয় Appreciation। বর্তমান পাঠে আমরা Devaluation -এর পাশাপাশি অন্যান্য ধারণাগুলোও ব্যাখ্যা করব। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুদ্রার অবমূল্যায়ন ব্যাখ্যা করা এবং এর প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগের ফলাফল তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে বিশেওষণ করা। প্রথমেই আমরা দেখব মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে কী বুঝায় এবং কীভাবে এ হার নির্ধারিত হয়। মুদ্রার অবমূল্যায়ন ব্যাখ্যা করার জন্য বৈদেশিক বিনিময় হারের ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার (Foreign Exchange Rate)

একটি দেশের মুদ্রার এক এককের পরিবর্তে অপর একটি দেশের মুদ্রার যত একক ক্রয় করা যায় তাকে দেশটির মুদ্রার বিনিময় হার বলে। মুদ্রার বিনিময় হার হিসেবের দুটো পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ‘up is up' পদ্ধতি ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘ up is down' পদ্ধতি। আমার দেশীয় মুদ্রার কত একক দিয়ে এক একক বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় -এ হচ্ছে `up is down' পদ্ধতিতে বিনিময় হারের হিসেব। যুক্তরাষ্টেখ এমনকি আমাদের দেশেও এ পদ্ধতিতে মুদ্রার বিনিময় হার হিসেব করা হয়। অন্যদিকে, আমার দেশীয় মুদ্রার এক একক দিয়ে কতটি বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় -এ হিসেবটা হল ‘ up is up' পদ্ধতিতে বিনিময় হারের হিসেব। বৃটেনে এ পদ্ধতিতে বিনিময় হার হিসেব করা হয়। এখন চলুন একটি উদাহরণের সাহায্যে পদ্ধতি দুটো জেনে নিই। ধরুন, ১ ইউ এস ডলার = ৪২ টাকা। এখন, ৪২ টাকা/ডলার হচ্ছে ‘ up is down' পদ্ধতিতে ইউ এস ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার। অন্যদিকে, .০২৪ ডলার/টাকা হচ্ছে ‘up is up' পদ্ধতিতে ইউ এস ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার।

মুদ্রার বিনিময় হার প্রধানতঃ দুই প্রকার - মুক্ত বা ভাসমান বিনিময় হার (Free or Floating Exchange Rate) এবং স্থির বিনিময় হার (Fixed Exchange Rate)।

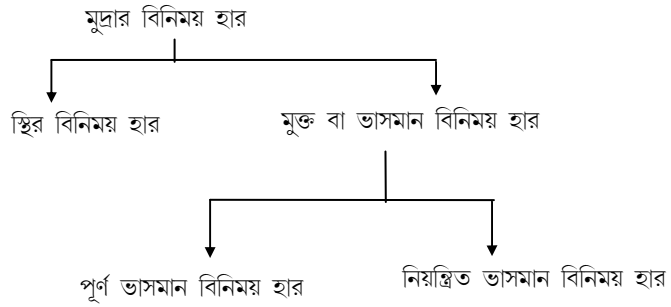

মুক্ত বা ভাসমান বিনিময় হার একটি মুক্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় বাজার (Foreign Exchange Market) -এর অস্তিত্ব নির্দেশ করে যেখানে বিভিন্ন মুদ্রার দাম নির্ধারিত হয় মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা। এখানে কোন প্রকার সরকারী হস্তক্ষেপ নেই। মনে করুন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্টথ থেকে ৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্রব্য আমদানি করতে চায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা হবে ৫ মিলিয়ন ডলারের সমান। অন্যদিকে, মনে করুন, যুক্তরাষ্টথ বাংলাদেশ থেকে ১০০ মিলিয়ন টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী নিতে চায়। সুতরাং বাংলাদেশের মুদ্রার যোগান হবে ১০০ মিলিয়ন টাকার সমান। সুতরাং আমরা একটি ভারসাম্য বিনিময় হার কল্পনা করতে পারি যে হারে মুদ্রার চাহিদা এবং যোগান (বৈদেশিক মুদ্রায় প্রকাশিত) সমান হবে। ভারসাম্য বিনিময় হারই হচ্ছে মুক্ত বা ভাসমান বিনিময় হার। ভাসমান বিনিময় হার একটি দেশের বাণিজ্যের ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতির সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি থাকলে অর্থাৎ আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে বেশী হলে মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পাবে। বিপরীতভাবে, মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে, স্থির বিনিময় হার নির্ধারিত হয় একটি সাধারণ মানদন্ডের নিরিখে। অতীতে স্বর্ণকে সাধারণ মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হতো। প্রতিটি দেশ স্বর্ণের মাধ্যমে তার মুদ্রার একটি স্থির মূল্য নির্ধারণ করে দিত এবং এই স্থির মূল্যে মুক্তভাবে দেশীয় মুদ্রাকে স্বর্ণে রূপান্তর করা যেত। স্বর্ণের রপ্তানি বা আমদানির উপর কোন প্রকার বিধি-নিষেধ ছিল না। যেহেতু প্রতিটি মুদ্রারই একটি স্থির স্বর্ণমান ছিল সেহেতু বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নির্ধারিত হতো। মনে করুন, এক ডলার = .০২ আউন্স স্বর্ণ এবং এক জার্মান মার্ক = .০১ আউন্স স্বর্ণ। সুতরাং এক মার্কিন ডলারের বিনিময় হার = ২ জার্মান মার্ক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়টি ছিল মার্কিন ডলারের যুগ। এ সময় অ-কম্যুনিষ্ট দেশসমূহ মূলতঃ ডলারের মাধ্যমেই নিজেদের মুদ্রার মান নির্ধারণ করত। তবে, যেহেতু এ সময়কালে ডলার স্বর্ণে রূপান্তরযোগ্য ছিল সেহেতু এটাও ছিল এক ধরনের স্বর্ণমান বিনিময় হার। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয় তা হচ্ছে এক ধরনের নিয়ন্ত্রিত ভাসমান পদ্ধতি (Managed Floating System)। এ পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় চাহিদা-যোগান প্রক্রিয়া ও সরকারী হস্তক্ষেপের সমন্বয়ে এবং কোন কোন মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয় এক বা একাধিক মুদ্রার নিরিখে।

অনুশীলন

বাংলাদেশে কোন্ ধরনের বিনিময় হার প্রচলিত আছে? লিখুন। নিচের কোন্ ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ রয়েছেঃ Depreciation, Appreciation, Devaluation, Revaluation.

মুদ্রার মূল্য-হ্রাস, মুল্য-বৃদ্ধি এবং উর্ধ-মূল্যায়ন
(Depreciation, Appreciation and Revaluation)

যখন একটি দেশের মুদ্রার তুলনায় অন্য একটি দেশের মুদ্রার মান বাড়ে তখন বলা হয়ে থাকে যে, আলোচ্য দেশটির মুদ্রার মূল্য হ্রাস পেয়েছে (Depreciated) এবং অন্য দেশটির মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে (Appreciated)। ভাসমান বিনিময় হার পদ্ধতিতে মুদ্রার মূল্য-হ্রাস ও বৃদ্ধি একটি সাধারণ ঘটনা এবং আমদানি ও রপ্তানির হ্রাসবৃদ্ধির সাথে এটি সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। মনে করুন, বাংলাদেশী টাকা ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার হচ্ছে ১ ডলার = ৪২ টাকা। মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তথা আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ দ্বারা এ হার নির্ধারিত হয়েছে। এখন মনে করুন, বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্টথ থেকে পূর্বের চেয়ে বেশী পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করতে চায়। এতে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। যদি বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ তথা ডলারে প্রকাশিত টাকার যোগান স্থির থাকে তাহলে বাংলাদেশী মুদ্রায় ডলারের দাম বৃদ্ধি পাবে। ডলারের জন্য এটা মূল্য-বৃদ্ধি (Appreciation) এবং টাকার ক্ষেত্রে

এটা মূল্য-হ্রাস (Depreciation) নির্দেশ করে। নিচের চিত্রের সাহায্যে appreciation ও depreciation ব্যাখ্যা করা হলো। চিত্রে DD এবং

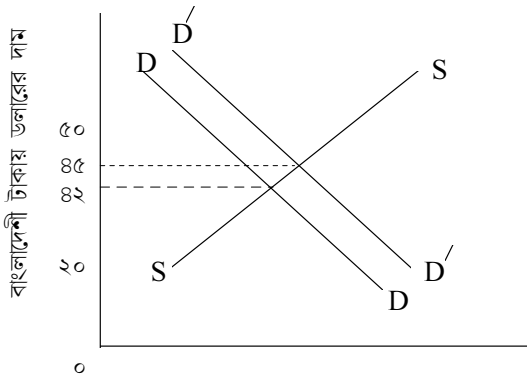

চিত্র : ৮.৪ মুদ্রার মুল্য-হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি

SS যথাক্রমে ডলারের প্রাথমিক চাহিদা ও যোগান রেখা। সুতরাং ডলারের প্রাথমিক ভারসাম্য দাম = ৪২ টাকা। ডলারের চাহিদা (দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি) বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থনান্তরিত হয়। D′D′ নতুন চাহিদা রেখা। নতুন ভারসাম্য দাম = ৪৫ টাকা যা টাকার depreciation এবং ডলারের appreciation নির্দেশ করছে।

মুদ্রার উর্ধ-মূল্যায়ন (Revaluation) বলতে সরকারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মুদ্রার উচ্চ বিনিময় হার নির্ধারণ করাকে বুঝায়। লেনদেন ভারসাম্য বা বাণিজ্যের ভারসাম্যের ক্রমাগত উদ্বৃত্ত দূর করার জন্য এটি একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচ্য। মুদ্রার উর্ধ-মূল্যায়নের ফলে বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানি-দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে এবং দেশীয় মুদ্রায় আমদানি দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমে। ফলে রপ্তানির পরিমাণ কমে এবং আমদানির পরিমাণ বাড়ে। সুতরাং মুদ্রার উর্ধ্ব-মূল্যায়ন দ্বারা বাণিজ্যের ভারসাম্য তথা লেনদেন ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত দূর করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য যে, খুব কম দেশই স্বতঃস্ফুর্তভাবে মুদ্রার উর্ধ-মূল্যায়ন করে থাকে, কারণ লেনদেন ভারসাম্য বা বাণিজ্যের ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত একটি দেশের সাফল্য হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

অনুশীলন

ধরুন, বর্তমানে ১ ডলার = ৪২.৫০ টাকা। আগামী মাসে টাকার দাম পরিবর্তিত হয়ে ১ ডলার = ৪৩ টাকা হলো। এক্ষেত্রে টাকার বিনিময় হারের কী ধরনের পরিবর্তন হলো? লিখুন।

মুদ্রার অবমূল্যায়ন (Devaluation of Currency)

এ পাঠের ভূমিকাতেই মুদ্রার অবমূল্যায়নের ধারণাগত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা মুদ্রার অবমূল্যায়নের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করব। কোন একটি দেশ ক্রমাগতভাবে লেনদেন ভারসাম্য বা বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতির সম্মুখীন হলে মুদ্রার অবমূল্যায়নের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। সাধারণতঃ অন্যান্য পদ্ধতিগুলো (যেমন - রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, আমদানির উপর কোটা আরোপ প্রভৃতি) অকার্যকর বিবেচিত হলে একটি দেশ মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে থাকে।

মুদ্রার অবমূল্যায়নের তাৎক্ষণিক ফলস্বরূপ আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের তুলনামূলক দামের পরিবর্তন ঘটে। অন্যভাবে বলা যায়, অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় রপ্তানি দ্রব্যের দাম কমে এবং দেশীয় মুদ্রায় আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে আমদানি হ্রাস পায় এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। এর ফলস্বরূপ লেনদেন ভারসাম্য তথা বাণিজ্যের ভারসাম্যের ঘাটতি দূরীভূত হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক্। মনে করি, মুদ্রার অবমূল্যায়নের পূর্বে ১ ডলার = ৪০ টাকা ছিল। এ সময় বাংলাদেশ ৫,০০০ পাউন্ড চা মার্কিন যুক্তরাষ্টেথ রপ্তানি করে। মনে করি, প্রতি পাউন্ড চায়ের রপ্তানি মূল্য = ৪০ টাকা = ১ ডলার। সুতরাং বাংলাদেশের রপ্তানি আয় = ৫,০০০ ডলার বা ২০০,০০০ টাকা। এখন মনে করুন, একই সময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্টথ থেকে ২৫,০০০ কে.জি. গম আমদানি করে। প্রতি কে.জি. গমের আমদানি মূল্য = ২৫ সেন্ট = .২৫ ডলার = ১০ টাকা। সুতরাং বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় = (২৫,০০০*.২৫) = ৬২৫০ ডলার = (৬২৫০*৪০) = ২৫০,০০০ টাকা। সুতরাং বাংলাদেশের বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি = ১,২৫০ ডলার বা ৫০,০০০ টাকা। বাণিজ্যের ঘাটতি দূর করার জন্য ধরা যাক্, বাংলাদেশ সরকার টাকার অবমূল্যায়ন করে ১ ডলার = ৫০ টাকা নির্ধারণ করল। দেশীয় মুদ্রায় চায়ের রপ্তানি মূল্য রপ্তানিমূল্য অপরিবর্তিত থাকলেও

বিদেশীমুদ্রায় প্রতি পাউন্ড চায়ের রপ্তানিমূল্য হবে ৮০ সেন্ট বা .৮ ডলার যা পূর্বের চেয়ে কম। যেহেতু বিদেশী মুদ্রায় চায়ের দাম কম সেহেতু চায়ের চাহিদা বাড়বে। মনে করি, যুক্তরাষ্ট্থ এখন ৭৫০০ পাউন্ড চা বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে। সুতরাং বাংলাদেশের রপ্তানি আয় হবে = (৭৫০০*.৮) = ৬,০০০ ডলার = (৬,০০০*৫০) = ৩০০,০০০ টাকা। একইভাবে, ডলারের হিসেবে যদি গমের দাম অপরিবর্তিত থাকে তাহলে টাকার হিসেবে প্রতি কে.জি. গমের দাম হবে = (.২৫*৫০) = ১২.৫০ টাকা। যেহেতু দেশীয় মুদ্রায় গমের দাম বেড়েছে সেহেতু গমের আমদানি চাহিদা কমবে। মনে করি, বাংলাদেশ এখন ২০,০০০ কে.জি. গম আমদানি করে। বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় = (২০,০০০*.২৫) = ৫,০০০ ডলার = (৫,০০০*৫০) = ২৫০,০০০ টাকা। সুতরাং বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য = (৬,০০০-৫,০০০) = ১,০০০ ডলার বা ৫০,০০০ টাকা যা বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত হিসেবে পরিচিত।

মুদ্রার অবমূল্যায়নের কার্যকারিতা

বাণিজ্যের ঘাটতি বা লেনদেনের ঘাটতি দূর করার জন্য মুদ্রার অবমূল্যায়ন ব্যাপকভাবে স্বীকৃত এবং বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতি হলেও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে দেখা যায় যে, মুদ্রার অবমূল্যায়নের তাৎক্ষণিক প্রভাব (Impact Effect) ইতিবাচক হলেও এর দীর্ঘকালীন কার্যকারিতা (Steady - State Effect) সম্পর্কে নিঃসন্দেহে কিছু বলা কঠিন। তাৎক্ষণিক প্রভাব সাধারণতঃ অবমূল্যায়নের বছরের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। অন্যদিকে, দীর্ঘকালীন প্রভাব সাধারণতঃ অবমূল্যায়নের তিন/চার বছরের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। সঠিকভাবে অবমূল্যায়নের কার্যকারিতা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে।

মুদ্রার দেশীয় মানের পরিবর্তন: এটা ধরে নেয়া হয় যে, অবমূল্যায়নের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে শুধুমাত্র মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার হ্রাস পায়। দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রার মানের কোন পরিবর্তন হয় না। এর অর্থ হলো, অবমূল্যায়নের ফলে উৎপাদন খরচের কোন পরিবর্তন হয় না এবং দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্যের দামেরও কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। অবমূল্যায়নের ফলে মুদ্রার দেশীয় মান যদি হ্রাস পায় অর্থাৎ উৎপাদন খরচ তথা দ্রব্যের দাম বাড়ে তাহলে অবমূল্যায়ন দ্বারা কাংখিত ফল লাভ সম্ভব নাও হতে পারে।

রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা: রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যদি একক অপেক্ষা কম হয় ($|E_X|<1$) তাহলে মুদ্রার অবমূল্যায়ন দ্বারা বাণিজ্যের ঘাটতি দূর করা সম্ভব নয়। রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে ছোট হবার অর্থ হচ্ছে এই যে, দ্রব্যের দাম যতই হ্রাস পাক না কেন, রপ্তানি চাহিদা খুব একটা বাড়বে না। এক্ষেত্রে অবমূল্যায়নকারী দেশের রপ্তানি আয় কমে যেতে পারে।

আমদানি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা: রপ্তানি দ্রব্যের মতো আমদানি দ্রব্যের চাহিদাও যদি অস্থিতিস্থাপক হয় ($|E_M|<1$) তবে অবমূল্যায়ন কার্যকর হবে না। আমদানি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে দ্রব্যের দাম যতই বাড়ুক না কেন, আমদানির পরিমাণ খুব একটা কমবে না। এতে অবমূল্যায়নকারী দেশটির আমদানি ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।

মার্শাল-লার্নার শর্ত (Marshall - Lerner Condition): মার্শাল ও লার্নারের মতানুসারে, একটি দেশের রপ্তানি-চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং আমদানি-চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরম মানের (Absolute Value) যোগফল একের চেয়ে বেশী হলে ($|Ex+Em|>1$) মুদ্রার অবমূল্যায়ন করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি দূর করা সম্ভব। $|Ex+Em| = 1$ হলে বাণিজ্যের ভারসাম্যের কোন পরিবর্তন হবে না। পক্ষান্তরে, $|Ex+Em|<1$ হলে ঘাটতি আরো বাড়বে। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্শাল-লার্নার শর্তের সত্যতা প্রমানিত হয়েছে।

অনুশীলন
বাংলাদেশে **মার্চ ১৯৯৬** থেকে **আজ** পর্যন্ত কতবার মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে? লিখুন। এতে কি আমাদের আমদানী-রপ্তানীর উপর কোন্‌রূপ প্রভাব পড়েছে? চিন্তা করুন ও লিখুল।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. .৪৬ টাকা/ইয়েন হচ্ছে up is down পদ্ধতিতে বিনিময় হারের হিসাব - সত্য/মিথ্যা
২. পূর্ণ ভাসমান বিনিময় হার নির্ধারণে সরকারের হস্তক্ষেপ শূন্য - সত্য/মিথ্যা
৩. মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে আমদানি বৃদ্ধি পায় - সত্য/মিথ্যা
৪. মুদ্রার উর্ধ্বমূল্যায়নের ফলে দেশীয় মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পায় - সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মুদ্রার বিনিময় হার বলতে কী বুঝায়?
২. স্থির বিনিময় হার ও ভাসমান বিনিময় হারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কীভাবে মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা করুন।

২. মুদ্রার মূল্য-হ্রাস ও মূল্য-বৃদ্ধির পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।
৩. মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও উর্ধ-মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৪. মুদ্রার অবমূল্যায়নের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করুন।
৫. মুদ্রার অবমূল্যায়ন কি সবসময় একটি দেশের বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে পারে? ব্যাখ্যা করুন।
৬. মার্শাল-লার্নার শর্তটি ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. সরকারীভাবে মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি করা হলে তাকে
   ক. Appreciationবলা হয়
   খ. Depreciation বলা হয়
   গ. Revaluation বলা হয়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
২. মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে
   ক. আমদানি বৃদ্ধি পায়
   খ. আমদানি হ্রাস পায়
   গ. রপ্তানি হ্রাস পায়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৩. একটি অর্থনীতির ঘাটতি হ্রাস করার জন্য
   ক. মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়
   খ. মুদ্রার উর্ধ্বমূল্যায়ন করা হয়
   গ. মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখা হয়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৪. মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে রপ্তানি বাড়বে
   ক. যদি রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়
   খ. যদি রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়
   গ. যদি রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক হয়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৫. মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফল পাওয়ার জন্য
   ক. । Em + Ex । = 1 হওয়া প্রয়োজন
   খ. । Em + Ex । < 1 হওয়া প্রয়োজন
   গ. । Em + Ex । > 1 হওয়া প্রয়োজন
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

মনে করুন, কোন একটি দেশের আমদানি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা = .৩ এবং রপ্তানি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা = .৮। দেশটি কি মুদ্রার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে বাণিজ্যের ভারসাম্য পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারবে?

পাঠ-৬ আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থাসমূহ (International Financial Organizations)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার উৎপত্তি, গঠন সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বাংলাদেশের সাথে এ সকল সংস্থার সম্পর্ক বিশেøষণ করতে পারবেন।

ভূমিকা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক সাহায্য এবং অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উন্নয়ন সাহায্য কমিটিভূক্ত দেশসমূহ বাদ দিলে আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমূহ হচ্ছে ঋণ ও অনুদানের বৃহত্তম উৎস। আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমূহে মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF - International Monetary Fund), আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development) যা সংক্ষেপে বিশ্বব্যাংক (World bank) নামে পরিচিত, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA - International Development Agency), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB - Asian Development Bank), ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB - Islamic Development Bank) এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থা (IFC - International Finance Corporation)। বর্তমান পাঠে আমরা প্রথম তিনটি সংস্থার গঠন ও কার্যপ্রণালী আলোচনা করব। এর কারণ দুটো - প্রথমতঃ পরিসরের সংক্ষিপ্ততা এবং দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমূহের মধ্যে আয়তন (size) এবং ঋণ প্রদানের ক্ষমতার দৃষ্টিকোন থেকে এ তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সবশেষে, আমরা বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থার সম্পর্ক আলোচনা করব।

আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমূহের গঠন ও কার্যপ্রণালী

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)

উৎপত্তি: দুই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান মুদ্রা পদ্ধতির ব্যর্থতার ফলশ্রুতি হিসেবে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল বা আই.এম.এফ -এর উদ্ভব ঘটে। ১৯১৪ -এর পূর্ব পর্যন্ত স্বর্ণমান মুদ্রা পদ্ধতি মোটামুটি মসৃনভাবে কাজ করে আসছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন দেশ স্বর্ণমান পদ্ধতি থেকে সরে আসে। ১৯১৯ সালের পর স্বর্ণমান পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে এ পদ্ধতি আবার ভেঙে পড়ে। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থায় বিশৃংখলা এবং অস্থিরতা দেখা দেয়। স্বর্ণমান পদ্ধতির এ ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্টেথর নিউ হ্যাম্পশায়ার অংগরাজ্যের ব্রেটন উড্স্ (Bretton Woods) নামক স্থানে ৪৪ টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্স বিশ্ব অর্থনীতির নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে -

১. বিশ্ব-শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক পদ্ধতিতে স্থিরতা আনয়ন

২. যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের পুর্নগঠনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

৩. বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুন্নত ও উন্নয়নকামী আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের প্রক্রিয়ায় উন্নত দেশসমূহের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন।

এ কথায় বলা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য উন্নয়ন এবং জাতীয় মুদ্রাসমূহের বহু-রূপান্তরযোগ্যতা (multiconvertibility) -কে উৎসাহিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে স্থিরতা এবং শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের উৎপত্তি ঘটে।

তহবিল গঠন ও কার্যপ্রণালী: মূলতঃ সদস্য রাষ্টথসমূহের প্রদত্ত টাকা দিয়ে তহবিল গঠন করা হয় বলে সংস্থাটির নাম আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল। সদস্য রাষ্ট্রসমূহ তাদের চাঁদার কোটার ২৫% স্বর্ণের মাধ্যমে পরিশোধ করে থাকে। অবশিষ্ট ৭৫% পরিশোধ করতে হয় নিজস্ব মুদ্রার মাধ্যমে। প্রতিটি দেশের কোটা নির্ধারিত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একটি দেশের গুরুত্বের নিরিখে। ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের যাত্রা শুরু হয় ৪০ টি রাষ্টথ এবং তাদের প্রদত্ত ৭,৫০০ মিলিয়ন ডলারের সমান কোটা নিয়ে। ১৯৭৭ সালের জুনের শেষে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩১ -এ উন্নীত হয় এবং মোট কোটার পরিমাণ দাড়ায় ২৯,২১৭.৫ মিলিয়ন এস.ডি.আর (Special Drawing Rights)। সঞ্চিত তহবিল থেকে আই.এম.এফ বিভিন্ন দেশকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য প্রয়োজন মাফিক স্বর্ণ অথবা বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করার ক্ষমতা রাখে।

কার্য সম্পাদনের দৃষ্টিকোন থেকে আই.এম.এফ কে **প্রথমতঃ** এক ধরনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বর্ণনা করা যায়। দেশের অভ্যন্তরে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে ধরনের ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আই.এম.এফ সে ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারলেও একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতোই আই.এম.এফ নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করে থাকে -

১. আই.এম.এফ সীমিত পরিসরে হলেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঋণ প্রদানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত

২. সীমিত পরিসরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মুদ্রা সৃষ্টি এবং

৩. বৈদেশিক ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত মীমাংসার নিকাশঘর হিসেবে কার্যসম্পাদন।

দ্বিতীয়তঃ স্বর্ণ, এস.ডি.আর ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নিজস্ব মুদ্রার মাধ্যমে গঠিত মূলধন ও রিজার্ভ এবং আন্তর্জাতিক বিনিময় বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণের মাধ্যমে আই.এম.এফ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্থির রাখতে চেষ্টা করে। আই.এম.এফ -এর দৃষ্টিকোন থেকে বহুজাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য উন্নয়নের জন্য মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিরতা অপরিহার্য।

তৃতীয়তঃ আই.এম.এফ বিভিন্ন দেশের আর্থিক নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

চতুর্থতঃ আই.এম.এফ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে অনুন্নত রাষ্ট্রসমূহকে প্রশিক্ষণ এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বিশ্বব্যাংক (World Bank or IBRD)

উৎপত্তিঃ আই.এম.এফ -এর মতো বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংকও ব্রেটন উড্স কনফারেন্সের ফসল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বহুজাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রানহানি এবং সম্পদের বিনাশ ঘটে। ব্রিটেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের পুর্নগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, সাথে সাথে এটাও অনুভূত হয় যে, বিশ্বব্যাপী আয়ের বৈষম্য এবং জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য শ্বাশ্বত শান্তি অর্জনের পথে এক বিরাট অন্তরায়। উপরোক্ত দ্বিবিধ উপলব্ধি থেকে ১৯৪৪ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্যাবলীঃ বিশ্বব্যাংক হলো এক ধরনের আন্তর্জাতিক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান যা সদস্যদের চাঁদার মাধ্যমে মূলধন গড়ে তোলে। এখানে উল্লেখ্য যে, যে কোন দেশ ব্যাংকের চার্টারে উপযুক্ত পরিমাণ চাঁদা প্রদান করে সদস্যপদ লাভ করতে পারে এবং প্রয়োজনে সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে পারে। বিশ্বব্যাংকের প্রধান প্রধান কাজগুলো নিম্নরূপ -

১. উৎপাদনশীল বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক সদস্য রাষ্ট্রসমূহের পুনর্গঠন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

২. বিশ্বব্যাংক সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে অনুন্নত দেশসমূহে বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করে থাকে। ঋণ প্রদান অথবা সরাসরি বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে।

৩. ন্যায়সংগত শর্তে বেসরকারী মূলধন সংগ্রহ করা না গেলে বিশ্বব্যাংক নিজস্ব তহবিল অথবা ধারকৃত তহবিল থেকে সহজ শর্তে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৪. দীর্ঘমেয়াদে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহের লেনদেন ভারসাম্যের স্থিতি রক্ষার উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাংক সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উৎপাদনশীল সম্পদের উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করে থাকে।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (International Development Agency - IDA).

উৎপত্তিঃ বিশ্বব্যাংকের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৫৯ সালের ১লা অক্টোবর আই.ডি.এ প্রতিষ্ঠিত হয়। আই.ডি.এ -এর ধারণাটি প্রস্তাবাকারে প্রথম পেশ করেন তদানীন্তন মার্কিন সিনেটর মনরোনি (Monroney) এবং এটি প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার কর্তৃক সমর্থিত হয়। যে মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আই.ডি.এ প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো - উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান। বিশ্বব্যাংক এ ধারণাটি সমর্থন করে কারণ বিশ্বব্যাংক উপলব্ধি করে যে, উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব বিশ্বব্যাংকের পাশাপাশি ধনী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলোও বহন করতে পারে।

কার্যাবলীঃ আই.ডি.এ মূলতঃ দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণ প্রদানের শর্ত বিশ্বব্যাংকের চেয়েও সহজতর। উদাহরণস্বরূপ, ৫০ বছর মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে আই.ডি.এ ১০ বছর 'অতিরিক্ত সময়' (Grace Period) প্রদান করে থাকে যে সময়ে শুধুমাত্র ঋণের সুদ প্রদান করতে হয়। বিশ্বব্যাংক অপেক্ষা আই.ডি.এ -র সুদের হারও কম। আই.ডি.এ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রশাসনিক খরচ মেটানোর জন্য .৭৫% হারে চার্জ (charge) প্রদান করতে হয়। দরিদ্রতর দেশগুলোর জন্য আই.ডি.এ ঋণ সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যে সমস্ত দেশ বিশ্বব্যাংকের দেওয়া শর্তসমূহ পালন করে ঋণলাভ করতে সক্ষম নয়, সে সকল দেশ আই.ডি.এ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আই.ডি.এ -র মূল শর্ত হলো এই যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি দেশের উন্নয়নের জন্য একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমূহ

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমূহ। ১৯৮৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ এ সকল সংস্থা থেকে মোট ৫৮০৬.৭ মিলিয়ন ডলার সাহায্য লাভ করে যার মধ্যে ১৬৭৩.৯ ডলার ছিল অনুদান এবং ৪১৩২.৮ ডলার ছিল ঋণ সাহায্য। আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমূহের মধ্যে আই.ডি.এ বাংলাদেশকে সর্বাধিক পরিমাণ সাহায্য প্রদান করেছে, ১৯৮৮ সালের জুন পর্যন্ত যার পরিমাণ ছিল ২৭৪৮.৮ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহায্য লাভ করে ইউ.এন

সিস্টেমের৷ নিকট থেকে। উপর্যুক্ত সময়ে এর পরিমাণ ছিল ১০২১.২ মিলিয়ন ডলার। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে বাংলাদেশ এ সময়ে ৯৩৯.৯ মিলিয়ন ডলার সাহায্য লাভ করে। ১৯৮৮ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক/বহুমুখী সংস্থা থেকে যে পরিমাণ সাহায্য লাভ করে তার হিসাব নিচের সারণীতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী ৮.৮: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক/বহুমুখী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সাহায্য, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ৩০শে জুন ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত (মিলিয়ন ডলার)

সংস্থাসমূহ	অনুদান	ঋণ	মোট
ই.ই.সি	৪৬৭.৭	৪৮.০	৫১৫.৭
ইউনিসেফ	১৭৯.৭	-	১৭৯.৭
ইউ.এন.সিস্টেম	১০১৬.০	৫.২	১০২১.২
এ.ডি.বি.	০.৪	৯৩১.৫	৯৩১.৯
আই.ডি.এ	-	২৭৪৮.৮	২৭৪৮.৮
আই.ডি.বি	০.৪	১৭৫.৭	১৭৬.১
আই.এফ.এ.ডি	০.২	৮৮.৭	৮৮.৯
ওপেক	-	১২৪.৭	১২৪.৭
ফোর্ড/এশিয়া	৯.৪	-	৯.৪
ফাউন্ডেশন	-	২.৩	২.৩
আই.এফ.সি			
উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৮৯/৯০, পৃঃ ২৬০			

অনুশীলন

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থসংস্থা থেকে কী পরিমাণ সাহায্য গ্রহণ করেছে। কোন্ আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী অর্থসাহায্য পেয়েছে?

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

সত্য-মিথ্যা

১. আই.এম.এফ এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৭ সালে - সত্য/মিথ্যা
২. ব্রেটন উড্স্ কনফারেন্সে ৪৯ টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল - সত্য/মিথ্যা
৩. বিশ্বব্যাংক হলো এক ধরনের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান - সত্য/মিথ্যা
৪. আই.ডি.এ. উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে - সত্য/মিথ্যা
৫. বিশ্বব্যাংক অপেক্ষা আই.ডি.এ -এর সুদ বেশী - সত্য/মিথ্যা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের উৎপত্তি, গঠন ও কার্যপ্রণালী বিশেণ্ডষণ করুন।
২. বিশ্বব্যাংকের উৎপত্তি ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করুন।
৩. আই.ডি.এ -র উপর সংক্ষিপ্ত টাকা লিখুন।
৪. আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থাসমুহের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিশেণ্ডষণ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. IMF এর যাত্রা শুরু হয়
   ক. ১৯৪৫ সালের ২রা আগস্ট
   খ. ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ
   গ. ১৯৪৭ সালের ৩০শে মার্চ
   ঘ. ১৯৫০ সালের ২১শে মে।
২. বিশ্বব্যাংকের জন্ম হয়
   ক. ১৯৪৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর
   খ. ১৯৪৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর
   গ. ১৯৪৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর
   ঘ. ১৯৫৫ সালের ৩রা মার্চ।

৩. আই.ডি.এ. প্রতিষ্ঠিত হয়
   ক. ১৯৫১ সনে
   খ. ১৯৫৯ সনে
   গ. ১৯৫৫ সনে
   ঘ. ১৯৬০ সনে।
৪. সহজশর্তে ঋণ প্রদান করে
   ক. বিশ্বব্যাংক
   খ. আই.এম.এফ
   গ. আই.ডি.এ
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
৫. আই.ডি.এ. ধারণাটি প্রথম প্রস্তাব করেন
   ক. আইজেন হাওয়ার
   খ. মার্কিন সিনেটর মনোরনি
   গ. মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সমস্যা

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ ঋণের ভারে জর্জরিত। প্রতি বছর বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ঋণের সুদ হিসেবে সরকারকে প্রদান করতে হয়। এখন বলুন, কোন্ আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী ঋণ গ্রহণ করেছে? ঋণের পরিমাণ কত?

উত্তরমালা

পাঠ-১

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য, ৪. সত্য, ৫. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ, ২. খ, ৩. গ, ৪. গ, ৫. খ

পাঠ-২

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. ক,

পাঠ-৩

সত্য-মিথ্যা

১. মিথ্যা, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য, ৪. সত্য, ৫. মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ক, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. খ

পাঠ-৪

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ক, ২. গ, ৩. ক, ৪. খ, ৫. খ

পাঠ-৫

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. সত্য, ৩. মিথ্যা, ৪. সত্য

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. গ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ক, ৫. গ

পাঠ-৬

সত্য-মিথ্যা

১. সত্য, ২. মিথ্যা, ৩. সত্য, ৪. সত্য, ৫. মিথ্যা

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ, ২. খ, ৩. খ, ৪. গ, ৫. খ